চতুর্দোলা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

বিমলারঞ্জন
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
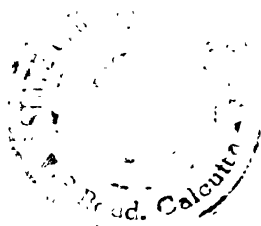
উৎসর্গ

শ্রীযুত হরিদাস পাল

শ্রীচরণেষু-

এই লেখকের—

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
ভাড়াটে বাড়ী
মনে ছিল আশা
রজনীগন্ধা
বহু বিচিত্র
স্বর্ণ মুকুর
প্রভাত-সূর্য্য
নবযৌবন
পুরুষ ও রমণী
রাত্রির তপস্যা
নববধূ
কোলাহল

সঙ্কোচ

মির্জাপুর ষ্ট্রীট এবং তাহার কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে মেসের সংখ্যা বড় কম নয়। কোনটা ছাত্রের, কোনটা কেরাণীর, কোনটা বা ছাত্র-মাষ্টার-কেরাণী-উকিলের মিলিত আশ্রয়। তাহার কোনটা 'লজ', কোনটা 'ক্লাব', কোনটা বা নাম-গোত্র-হীন। বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জেলার লোকই এই সব বাসাগুলিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহারা আসে, কিছুদিন থাকে, আবার কোথায় মিলাইয়া যায় জনসমুদ্রে বুদ্বুদের মতই—কেহ খবরও রাখে না। দশ, পনেরো, কুড়ি বৎসর পরে, হয়ত কোন সুদূর মফঃস্বলে বা দৈবাৎ কলিকাতারই কোন রাস্তায় দেখা হইয়া গেলে এক পক্ষ হয়ত চিনিতেই পারে না, অপরপক্ষ মনে করাইয়া দেয়, 'কী, কেমন আছেন? চিন্‌তে পারছেন না? সেই যে সেই শ্রীগোপাল-মল্লিক লেনের সেই মেসে—ষোল নম্বর ঘর?' অন্যপক্ষ তখন বিস্মৃতির অপার সলিলে ক্ষীণ তটরেখা দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে বলেন, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে নগেনবাবু না? না, না, রাখালবাবু, ঠিক! কী করছেন আজকাল—' ইত্যাদি।

কিন্তু এইখানেও, জীবনের স্রোত যেখানে সবচেয়ে তীব্র সেখানেও, বিরাট প্রস্তরখণ্ডের মতই আমাদের ব্রজেনদা চিরস্থায়ী হইয়া বসিয়া আছেন আজ আটত্রিশ বৎসর। মেস যে ইতিমধ্যে বদল করেন নাই তাহা নয় কিন্তু এই পাড়া ছাড়েন নাই কখনও...এবং সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য, এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবারও দেশে কিম্বা বিদেশে যান নাই; তাঁহার জীবন মির্জাপুর ষ্ট্রীট এবং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ইহার মধ্যেই ছিল সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। দেশে তাঁহার ভাইপোরা ছিল, তাহাদের তিনি মধ্যে মধ্যে টাকা পাঠাইতেন জানি, তাহারা দেখা করিতেও আসিত কিন্তু তাহাদের কোনও অনুরোধে বা কোনও ক্রিয়া-

কলাপেই তিনি দেশে যাইতে রাজী হন নাই। এখানটায় তাঁহার কোন একটা ব্যথা ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু বিদেশেও তিনি যে কেন যাইতেন না সেটা কোনমতেই অনুমান করিতে পারিতাম না। জিজ্ঞাসা করিলেও একটু হাসিয়া বলিতেন, 'কী দরকার ভাই টানা-হেঁচ্‌ড়াতে, সারা পৃথিবী ত আর দেখতে পারব না, সে সঙ্গতিও নাই; শুধু শুধু একটা দুটো জায়গা দেখবার জন্য কতকগুলো টাকা খরচ আর হাঙ্গামা ক'রে লাভ কি? বেশ আছি!'

ব্রজেনদার এই অদ্ভুত মেস-প্রীতির কথা এ অঞ্চলের সকলেই জানিত—এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করিত। এই অঞ্চলের মেসে যাহারা থাকে তাহারা এ-বাসা ও-বাসা আনাগোনাও করে, পরস্পরের খবরও রাখে খানিকটা। ব্রজেনদাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্নও সহ্য করিতে হয় বড় কম নয় কিন্তু তিনি যেমন এ সব অযথা কৌতূহলে বিরক্তও হন না তেমনি কিছুতেই আসল কথাটা ভাঙ্গেন না। কেবল একদিন আমাদের সুনীলের কাছে কী একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, 'কী দেখ্‌তে ঘুরে বেড়াব—বল্‌ দেখি ভাই? তোরা ছেলেমানুষ, তোদের মনে আশা আছে, চোখে আছে রঙ—ওসব দেখার মানে হয়। আমার চোখে এখন কাশীর ঘাট আর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড় সব সমান। বাঁচারই আর কোন মূল্য নেই আমার কাছে—নেহাৎ আত্মহত্যা করা কাপুরুষতা ব'লেই করি নি। বাঁচতে হবে ব'লেই চাকরী করি, জীবনধারণ করতে গেলে টাকা চাই বলে তাই। সুখ আর কিছু নেই।'

ব্রজেনদা অথচ, যতদূর আমরা জানি, চাকরী ভালই করিতেন। মাহিনা ঠিক কত পাইতেন না জানিলেও, শ'দুই-এর কাছাকাছি যে তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। মেসে একমাত্র তিনিই একটা গোটা ঘর লইয়া থাকিতেন এবং তাঁহার তামাক সাজিবার জন্য ও সন্ধ্যাবেলা গা-হাত-পা টিপিবার জন্য একটা চাকরের অর্দ্ধেক খরচা তিনি বহন করিতেন। মানুষটি

ছিলেন অত্যন্ত শীর্ণ, সমস্ত দেহটা যেন দড়ী-পাকানো। রোগার উপর লম্বা বলিয়া সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া থাকিতেন সর্ব্বদাই, তাহার উপর হাঁটুর কাছটা ছিল ঈষৎ বাঁকা, সেজন্য জীবন্ত একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত দেখাইত তাঁহাকে। কিন্তু দেহে তাঁহার শ্রী-সৌষ্ঠব না থাক, হাসিটি ছিল ভারি মিষ্ট— একটি মাত্র দাঁত সামনের দিকে অবশিষ্ট ছিল, সেইটি বাহির করিয়া তিনি যখন মুখ টিপিয়া হাসিতেন, তখন মনে হইত যেন আমাদের সকলের জন্যই মানুষটির অন্তরে স্নেহ ভরা আছে।

এ হেন শান্ত সৌম্য নির্ব্বিরোধী মানুষটি আমাদের একটা তুচ্ছ তামাসার ব্যাপার লইয়া কেন যে অত চটিয়া গেলেন তাহা আমাদের কাছে আজও অনেকটা দুর্জ্ঞেয় হইয়া আছে।

কথাটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি—

আমাদের এ মেসটাতে ছাত্রের সংখ্যা ছিল অনেকগুলি, তাহার মধ্যে ডাক্তারী-ইস্কুলের ছাত্রও কয়েকটি ছিল; সেই সূত্রেই আর একটি ডাক্তারী ছাত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া শঙ্কর একদিন আমাদের মেসে আসিয়া উঠিল। অবশ্য ইহা এমন কিছু অসাধারণ ঘটনা নয়, মেসে লোক আসা-যাওয়া করেই, নূতন লোক আসিলে আমরা এক দফা পরিচয় করিয়া লইয়াই দলে টানিয়া লই, তারপর আর মাথা ঘামাই না, চলিয়া যাইবার সময়ও কাহারও বিরহে অস্থির হইয়া উঠিবার কারণ ঘটে না। কিন্তু শঙ্কর আসিতে আমরা যে তাহাকে লইয়া একটু বেশী রকম মাতামাতি করিয়াছিলাম, তাহার কারণ ছিল। প্রথম কথা, ছেলেটি অতিশয় সুদর্শন; দ্বিতীয় কথা, সে যেমন মিষ্টভাষী তেমনি আমুদে—মানুষের প্রিয় হইবার সব কয়টি গুণই তাহার আছে। সুতরাং তাহার সহিত একটু বিশেষ ভাবে মিশিবার, কাছে পাইবার ইচ্ছা আমাদের সকলেরই হইয়াছিল।

এই ভাবেই চলিতেছে, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম যে, 'আমরা

ছাড়াও আর একটি প্রাণী শঙ্কর সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে এবং সে কৌতূহল কৌতুকের সৃষ্টি করিয়াছে। সে প্রাণীটি আর কেহ নয় সামনের বাড়ীর গৌরী।

আমাদের মেসটা মির্জাপুর ষ্ট্রীটের উপরেই। চওড়া রাস্তা বলিয়াই হউক বা বয়স্ক লোক বেশী আছে বলিয়াই হউক, মেসের সামনের বাড়ীর লোকরা যতটা বিপদগ্রস্ত হয়, গৌরীর বাবা তত হন নাই—বস্তুত তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার সচেতনই ছিলাম না। গৌরী মেয়েটি একেবারেই কিশোরী, এবং এমন কিছু সুরূপাও নয়, তবে শ্রীময়ী বলা যায়। সেজন্যই বোধ হয় আমাদের বাসার ছাত্র কয়টিও কখন ওদিকে মন দেয় নেই। সহসা আমিই একদিন আবিষ্কার করিলাম যে গৌরী আজকাল সকাল-সন্ধ্যায় নানা অজুহাতে ছাদে আসে এবং শঙ্করের গলার আওয়াজ যে দিক হইতে পাওয়া যায় সেই দিকেই চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। খুবই প্রচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ছেলেমানুষ বলিয়া বোধ হয়, ধরা পড়িয়া গেল।

ব্যস্—খবরটা শুনিবার অপেক্ষা, সমস্ত মেসে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল এবং সে ঠাট্টা-তামাসার কলধ্বনি রাস্তা পার হইয়া ছাদের উপর মেয়েটির কানেও প্রবেশ করিয়া তাহাকে রাঙাইয়া তুলিল। ফল হইল এই যে ত্রিশ-বত্রিশ জোড়া চক্ষু তাহার গোপন দৃষ্টি-অভিসার লক্ষ্য করিতেছে বুঝিতে পারিয়া বেচারী ছাদের আশাই ছাড়িয়া দিল।

সে ছাড়িল বটে কিন্তু তাহাকে ছাড়িলে আমাদের চলে কি করিয়া? আমরা সবাই যেন তাহার এই ভীরু প্রণয় উপলক্ষ্য করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, এখন আর এত সহজে ছাড়িতে রাজী হইলাম না। উপেনদার এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ, তিনি একদিন রাস্তা পার হইয়া ও-বাড়ী গিয়া গৌরীর বাবার সহিত আলাপ করিলেন এবং লাফাইতে লাফাইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে গৌরীরা শঙ্করদেরই পাল্‌টি ঘর সুতরাং প্রণয়লীলা যদি একটু অগ্রসর হয় তাহা হইলেও বিয়োগান্ত ব্যাপারের সম্ভাবনা নাই।

চতুর্দোলা

শঙ্করের প্রথম দিকটায় খুব উৎসাহ ছিল না কিন্তু আমরা এমন ভাবেই তাহার কানের কাছে গুঞ্জন শুরু করিলাম যে ক্রমশঃ তাহার চোখেও স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিল, দৃষ্টি হইয়া আসিল রঙীন। আমাদের সহানুভূতি আছে বুঝিযাই হউক বা সে নিজেই থাকিতে পারিতেছিল না বলিয়াই হউক, গৌরীও আবার ছাদে দেখা দিল। ক্রমশঃ আমাদের দূতীয়ালিতে পত্র-ব্যবহার শুরু হইল, অল্প লেখাপড়া-জানা মেয়ের কাঁচা হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে অপটু প্রেম-নিবেদন, কিন্তু তাহাতেই আমাদের মাতামাতির শেষ রহিল না, শোনা গেল শঙ্করও চিঠিগুলি দিনে বুকপকেটে রাখে এবং রাত্রে বিছানায লইয়া শোয়। ইতিমধ্যে একদিন শঙ্করের সহিত আমাদের কয়েকজনের ও-বাড়ীতে নিমন্ত্রণও হইল। সেই উপলক্ষ্যে সিঁড়ির মুখে আব্‌ছায়ায় গৌরীর সঙ্গে কী করিয়া শঙ্করের দেখা হইযাছিল এবং পান লইবার সময় শঙ্কর গৌরীর কোমল উষ্ণ হাতখানি নিজের মুঠার মধ্যে অনুভব করিয়াছিল, সে সব তুচ্ছ কথা। মোটের উপর ব্যাপারটা খুব জমিযা উঠিল, এখন শুধু পরিণতিটাকে মধুরতম করিয়া তুলিবার অপেক্ষা মাত্র।

কিন্তু আমরা যখন এই বাইশ বছরের তরুণ এবং পনেরো-ষোল বছরের কিশোরীটির প্রণয়লীলার মাধুর্য্যে তন্ময় হইয়া ছিলাম তখন যে ব্রজেনদার অন্তরে এত বিদ্বেষ জমা হইতেছিল তাহা কল্পনাও করি নাই। হঠাৎ একধিন তিনি আমাকেই ডাকিয়া অত্যন্ত বকাবকি শুরু করিলেন, 'এ সব কী শুনি ? এটা ভদ্রলোকের মেস, এমন বেলেল্লাগিরি করলে ত আমরা আর থাকতে পারি নে। ...এসব কি শুরু করেছ তোমরা ?'

আমার বিস্ময়ের শেষ রহিল না। ব্রজেনদা এম্‌নিতেই অত্যন্ত নির্ব্বিরোধী, স্বভাবতই মিষ্ট। তিনি যে সামান্য ব্যাপারে এমন রূঢ় কথা বলিবেন তাহা কখনও আশা করি নাই। স্তম্ভিত ভাবটা কাটিলে কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা

করিলাম, 'বেলেল্লাগিরি ত কিছু হয়নি দাদা, শঙ্কর ছেলেটি ভাল, অথচ ওদের পাল্‌টি-ঘরও বটে, যদি ভদ্রলোকের কন্যাদায় উদ্ধার হয়—'

ব্রজেনদা খিঁচাইয়া উঠিলেন একেবারে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব ঢের জানা আছে। ভদ্রলোকের কন্যাদায়ের জন্যে ত ঘুম হচ্ছে না। এই পাড়াতেই ঢের আইবুড়ো মেয়ে আছে, কৈ তাদের জন্য ত চেষ্টা করছ না! যাও, যাও, ওসব বাজে কথা বলতে এসো না। তাদের গরজ থাকে তারা ওর বাপের কাছে ঘটক পাঠাক্‌—তোমাদের কি?'

ব্রজেনদার মাথায় একটা বড় রকমের গোলমাল হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া তখনকার মত আর ঘাঁটাইলাম না, নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম। মেসসুদ্ধ সকলেই ব্রজেনদার এই আকস্মিক উষ্মায় বিস্মিত হইল—কিন্তু বহু আলোচনাতেও কারণটা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

যাহা হউক, অতঃপর আমরা একটু সতর্ক হইলাম। তাঁহাকে ভয় করিবার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম বলিয়া অকারণে তাঁহাকে ব্যথা দিতে চাহিলাম না।

যদিচ, কথাটা একেবারে চাপিয়া রাখা গেল না কিছুতেই। আমরা তখন উৎসাহ আর আনন্দের তরঙ্গে নাচিতেছি—হাসির বন্যা বহিতেছে তখন অকারণেই। সুতরাং কাণাঘুষা, হাসিঠাট্টার টুক্‌রা ব্রজেনদার ঘরেও পৌছিয়া তাহার মনের মেঘকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছিল। ইহারই মধ্যে উপেনদার আগ্রহ ও চেষ্টায় একদিন দুপুরবেলা ছোট বোনের সঙ্গে গৌরীকে মেসে লইয়া আসা হইল এবং শঙ্করের সহিত দেখা করাইয়া দু-একটা কথাবার্ত্তারও সুযোগ দেওয়া হইল। তখন মেস খালিই ছিল প্রায়, আমরা দু-তিনটি লোক ছাড়া কথাটা কাহারও জানিবার কথা নয়, তবু কী করিয়া সেই দিনই ব্রজেনদার কানে উঠিল জানি না, পরের দিন ভোরে ব্রজেনদা ম্যানেজারের কাছে মেস ছাড়িবার নোটিশ দিলেন।

চতুর্দোলা

আমি, উপেনদা প্রভৃতি অপরাধীরা ব্রজেনদার ঘরে গিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেছে জানাইলাম —কিন্তু ব্রজেনদা অটল। সেই শীর্ণ, মধুর স্বভাবের মানুষটির মধ্যে এত জেদ আছে তা আগে জানিতাম না, তিনি নূতন বাসা খুঁজিয়া ঠিক করিলেন এবং শঙ্করের বিবাহের ঠিক আগের দিনটিতে সেখানে চলিয়া গেলেন; যদিও সে বাসা আমাদের ঠিক একখানা বাড়ী পরেই !

দীর্ঘদিন পরে এইভাবে ব্রজেনদাকে হারানোতে আমরা সকলেই দুঃখিত হইলাম কিন্তু ব্যাপারটা লইয়া বেশীক্ষণ মাথা ঘামাইবার অবসর হইল না। শঙ্করদের বিবাহের উৎসবে ব্রজেনদা একেবারেই হারাইয়া গেলেন।

ইহার পর পাঁচ-ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শঙ্কর ডাক্তারী পাস করিয়া দেশে গিয়া বসিয়াছে, গোরারও দু-তিনটি ছেলেমেয়ে হইয়াছে—এসব সংবাদ পাই লোক-পরম্পরায়। কদাচিৎ শঙ্কর ঔষধ কিনিতে আসিলে দেখা করে এই পর্য্যন্ত। আমাদের এই একঘেয়ে জীবনস্রোতের সহিত তাহাদের জীবনের ধারা বহুদিনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ পুরাতন বন্ধুদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে কথাটা উঠিলে তবে মনে পড়ে—নহিলে এক রকম যেন ভুলিয়াই গিয়াছি। একদা যে কথাটা লইয়া অত মাতামাতি করিয়াছিলাম আজ তাহা দূরতম স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ব্রজেনদা সেই বাসাতেই আছেন। আমরা মধ্যে মধ্যে খবর লইতে যাই, তিনিও আসেন এক-আধ দিন। শরীরটা তাঁহার ইদানীং খুবই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আমরা সকলেই কিছু বেশীদিনের ছুটি লইয়া পশ্চিম যাইতে বলি কিন্তু তাঁর সেই এক কথা—'কী আর হবে অত যত্ন ক'রে দেহটাকে বাঁচিয়ে —যা যাচ্ছে তাকে যেতে দাও !'

সহসা আশ্বিনের কাছাকাছি একদিন ও-মেসের চাকর আসিয়া সংবাদ

দিল—ব্রজেনদার অবস্থা খারাপ, আমাকে ডাকিতেছেন। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম। তাঁহার বিছানার পাশে যাঁহারা বসিয়াছিলেন ব্রজেনদার ইঙ্গিতে সকলেই বাহিরে চলিয়া গেলেন, বুঝিলাম আমার সহিত কিছু গোপনীয় কথা আছে।

ঘর খালি হইলে ইসারাতে আমাকে আরও কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'আমার এই বালিশের তলায় চাবী আছে, নিয়ে ঐ বাক্সটা খোল্ ভাই। ওপরে আমারই কাপড় জামা আছে, সেগুলো তুললে দেখ্‌তে পাবি খানকতক শাড়ী—সেইগুলো বার ক'রে আন্—'

শাড়ী! ব্রজেনদার বাক্সে! বিস্ময়ের অবধি রহিল না—কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও মায়া হইল, এই কটা কথা বলিয়াই তিনি হাঁপাইতেছেন।

বাক্স খুলিয়া উপরের শার্ট ধুতিগুলি সরাইতে বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। ছ সাতখানা শাড়ী, সবগুলিই মূল্যবান এবং নূতন—এখনও তাহাতে দোকানের লেবেল আঁটা রহিয়াছে। ঢাকাই, সিল্ক, মাদ্রাজী—নানাবর্ণের, নানা উপাদানের। কতকটা মূঢ়ের মতই শাড়ীগুলি হাতে করিয়া আবার তাঁহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিলাম। তাঁহার কণ্ঠস্বর আরও নামিয়া গিয়াছে ততক্ষণে, তিনি অতি কষ্টে কহিলেন, 'আমার আর বেশী দেরী নেই ভাই, বুড়োর একটা শেষ অনুরোধ রাখতে হবে। কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিস্ নি আমাকে, আমি বলতে পারব না।'

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল, অতি কষ্টে অশ্রু দমন করিয়া কহিলাম, 'বলুন দাদা—নিশ্চয়ই রাখব।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রজেনদা কহিলেন, 'সেই গৌরীকে মনে আছে তোর? সেই যার সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে হ'ল? তাকে এই শাড়ীগুলো পাঠিয়ে দিতে হবে। ঠিকানা ত তোরা জানিস!...বছর বছর পূজোর সময়ে তার জন্যেই এগুলো কিনেছিলাম কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে দিতে পারি নি।

কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়েছে—যদি কিছু মনে করে। এখন আর লজ্জা কি, বুড়োমানুষ তায় মরে যাবো—তবু কি সে নেবে না এগুলো? দিস্ ভাই যেমন ক'রে হোক তার কাছে পৌঁছে—কেমন?'

ব্রজেনদা চুপ করিলেন। ততক্ষণে তাঁহার শ্বাসকষ্ট শুরু হইয়াছে, তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সকলকে ডাকিলাম। তাঁহার ভাইপোরাও দেশ হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া কাপড়গুলার দিকে চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে ব্রজেনদা মারা গেলেন।

চোর

রতন উদ্বিগ্ন হ'যে কপাটটা ধ'রে দাঁড়িযেছিল অন্ধকারেই। আটটা বেজে গেছে, হারাণের ফেরবার সময় হয়ে এলো—এখনও যদি গোপাল এসে পড়ে তাহ'লে হয়। এর পর এলেও তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না। এমন কি গোপালকে সে ডেকে পাঠিয়েছে একথাও যদি হারাণের কানে যায় তা'হলে আর রক্ষা থাকবে না। রতনের অদৃষ্টে প্রহার তো আছেই, ছেলেটাও বাদ যাবে না।

কিন্তু গোপালই বা আসে না কেন? পাশের কলাঝাড়টা একটু নড়ে উঠতে রতন সাগ্রহে তাকালো সেদিকে, একবার চুপিচুপি প্রশ্নও করল, 'কেরে, গোপাল এলি?' কিন্তু তারপরই বুঝতে পারলো যে ওখানে যে নড়ছে সে গোপাল নয়—কুকুর। একটা ছোট দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে সে চুপ করে গেল। অন্ধকারে হঠাৎ বোঝাও যায় না মানুষ না কুকুর—অথচ আলো জ্বালবারও সাহস নেই, এ তবু অন্ধকার আছে, দূর থেকে হারাণকে

আসতে দেখলে চুপি চুপি গোপালকে সরিয়ে দিতে পারবে—আলো জ্বালা থাকলে ওর পক্ষে হারাণকে অন্ধকারে আসতে দেখা যেমন অসুবিধা, হারাণের তেমনি সুবিধা ওদের দেখা। রতন আজকাল তেল বাঁচাবার জন্যে রান্নাবান্না সেরে প্রায়ই আলো নিবিয়ে বসে থাকে, হারাণের সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

পাশের বাড়ীর কাদের ঘড়ীতে ঠং করে সাড়ে আটটা বাজল। আটটায় হারাণের ছুটি হয়েছে—আর বড় জোর দশ মিনিট, তার মধ্যে সে এসে পড়বেই। অথচ গোপালকে আজ একবার না দেখে সে বাঁচবে কেমন ক'রে। আহা বেচারা! সকালে নাকি সর্ষের তেলের কণ্ট্রোলে গিয়ে খাড়া রোদে আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল, তারপর কি একটা গোলমাল বাধে দোকানদারের সঙ্গে, ফলে সে পুলিশ ডাকে। যারা জোয়ান তারা সবাই ঠিক সময়ে পালিয়েছিল, পুলিশ আর দোকানদারের হাতে এলো-পাতাড়ি মার খেয়েছে বুড়ো আর ছোট ছেলেরা।, তাদের মধ্যে নাকি গোপালও ছিল। সেই কথা শুনে পর্য্যন্ত ওর বুকের মধ্যে হু হু করছে, ওর কত আদরের গোপাল। কখনো একটা চড়া কথা তাকে কেউ বলেনি।

তখনই সে পাশের বাড়ীর ঝি নন্দরাণীকে দিয়ে গোপালকে খবর পাঠিয়েছিল সন্ধ্যের পর একবার চুপি চুপি আসবার জন্য। গোপাল নাকি বলেছে যে তিনদিন তারা কেরোসিন তেল পায়নি, সারা রাত অন্ধকারে কাটাচ্ছে। আজ বিকেলে সে যাবে কেরোসিনের কণ্ট্রোলে দাঁড়াতে। তেল পেলেই সে চলে যাবে মায়ের কাছে, যদি দেরি হ'য়ে যায় তাহ'লে তেলের বোতল হাতে ক'রেই না হয় যাবে। কিন্তু এখনও তো এলনা, তেল কি এখনও পায়নি সে? না পেলেই বা এত রাত পর্য্যন্ত কি করছে, সন্ধ্যের পরও কি দোকানদার তেল দেয়? মনে ত' হয় না।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রতন কান পেতে দাঁড়াল। কে যেন

আসছে বটে কিন্তু সে গোপাল নয়। তার পায়ের আওয়াজ রতন চেনে—ভাল করেই চেনে। কুড়িটা লোকের পায়ের শব্দের মধ্য থেকে সে চিনে নিতে পারে। কে জানে আবার এবেলা কিছু হোল কিনা—ঐটুকু ছেলে তার। বেশী মার খেলে মরেই যাবে। একে খেতে পায না ভালো করে—শরীরে কি আছে!……ওর ইচ্ছে করতে লাগল যে ও ছুটে চলে যায় ছেলের কাছে—এই ত এপাড়া-ওপাড়া, এমন কি দূর, অথচ যাবাব কোন উপায় নেই। হাত-পা বাঁধা, আর সে বেড়ী সে-ই ইচ্ছা ক'রে পরেছে।

তপ্ত অশ্রুতে রতনের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হোয়ে এল। এ কী শাস্তি! এর চেয়ে সে মরতে পারল না কেন? মবতে পারেনি শুধু ওই গোপালের মুখ চেয়েই, গোপালের আর খুকীর। এক এক সময়ে অনুতাপে ওব মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে, ভগবান জানেন কথাটা সত্যিই!

উঁচু জাতের মেয়ে নয বটে সে কিন্তু ছোট কাজ কোনদিন করেনি। বাপ ওর চাকরী করত কী একটা কারখানায়, এক মেয়ে বলে রতনকে কখনও কষ্টের মুখ দেখতে দেযনি। রীতিমত ভদ্রলোকের মতই বাস করেছে তারা, সেইভাবেই মানুষ হযেছে। এমন কি বছর দু' তিন সে স্কুলেও গিয়েছিল। তারপব বিযে হ'ল বেশ ঘটা করেই। ওর স্বামী জীবন কোন্ এক ছাপাখানায় কাজ করত—জমাদারের কাজ। বড় প্রেস, মাইনে পেত ভালই। তার বিশেষ কেউ ছিল না। বুড়ো মা ওদের বিয়ের বছর-দুইয়ের মধ্যেই মরে গিয়েছিল। সুতরাং দুটি লোকের সংসার ওদের রাজার হালেই চলত। পাকাবাড়ীতে দোতলার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত ওরা, রবিবারে রবিবারে বাযস্কোপ দেখত; রতন ইচ্ছামত কাপড়-ওলা ডেকে শাড়ী কিন্ত—তার জন্য জীবন কোনদিন কিছু বলেনি। তারপর গোপাল হোল—খুকী হোল। সে যেন এক স্বপ্নে দেখা দিন—সংসার চলেছিল একটানা সুখের স্রোতে, আনন্দের পালে ভর করে।

গোপাল হবার পর বাবা মারা গেলেন বটে কিন্তু তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি। জীবন শাশুড়ীকে সসম্মানে নিয়ে এসে বাড়ীতে রেখেছিল, বলেছিল "আমার মা নেই, আপনিই আমার মা হয়ে থাকুন!"

সত্যি—জীবনের মত স্বামী পাওয়া কত সৌভাগ্যের কথা। লেখাপড়া সে বেশী শেখেনি কিন্তু কখনও একটা খারাপ গালাগাল দিতে কেউ শোনেনি তাকে। বিড়ি ছাড়া কোন নেশা করত না—কখনও হয়ত বিশ্বকর্ম্মা পূজো বা অমনি কোন উপলক্ষ্যে একটু আধটু মদ খেত কিন্তু মাতাল সে কোনদিন হয়নি।

তবে নাকি ভগবানের চোখে মানুষের সুখ বড় খারাপ লাগে—তাই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হোল—তিনদিনের জ্বরে হঠাৎ জীবন গেল মারা। সেবা করতে দিলে না, চিকিৎসা করতে দিলে না—যমরাজা একেবারে টেনে নিলে। উঃ—সেদিনের কথা ভাবা যায় না! একথা কোনদিন কল্পনাও করেনি কেউ, এতটুকু প্রস্তুত ছিল না ওরা। যাদের দিন কাটছিল সুখে ও বিলাসে, পরের দুঃখে যারা বড় লোকের মতই 'আহা' বলত, হঠাৎ তারা হ'য়ে পড়ল অসহায় নিঃসম্বল! স্বর্গ থেকে খসে এসে পড়ল যেন অকূল পাথারে! জীবন রোজগার করত ভাল বটে কিন্তু রাখতে কিছুই পারেনি। এত শীঘ্র যে মরবে তা সে ভাবেনি কোনদিন। একটা পাঁচশ টাকার ইনসিওরেন্স ছিল আর অফিস থেকে পাওয়া গিয়েছিল শ তিনেক টাকা, এ ছাড়া ওর আর মায়ের হালকা দু'একটা গয়না। এই সম্বল করেই ওরা গিয়ে উঠল একটা মাটির ঘরে। তখন পাঁচ বছরের ছেলে গোপাল আর তিন বছরের মেয়ে খুকী—ওদের মানুষ ক'রে তুলতে হবে এটা জানে কিন্তু কেমন ক'রে তা জানে না। কাজকর্ম্ম কিছুই জানত না, করতে গেলে ঝিয়ের কাজ করতে হয় কিন্তু তাতে মন সরে না কিছুতেই। সে যদি বা রাজি হয়, মা কান্নাকাটি করেন। রতন আকাশ পাতাল ভাবে, কোথাও কোন পথ, একটু আলো দেখতে পায় না।

তবু দিন কাটছিল একরকম ক'রে। কিন্তু তখন যুদ্ধ বেধে গেছে একটু একটু ক'রে দর বাড়তে শুরু করেছে সব জিনিষের। নিজেরা একবার খায়, আধপেটা খায়, একদিন অন্তর উপোষ করে—কিন্তু ছেলেদের তো কিছু দিতে হবে মুখে! তাও কুলোয় না কোন মতে। একটার পর একটা জিনিষ যায়, শেষে বাসন-কোসন শাড়ী জামা পর্য্যন্ত বিক্রী করে, তাও যখন শেষ হোয়ে এল তখন ধরলে চাক্‌রী—বাসনমাজার কাজ······অনভ্যস্ত হাত পদে পদে ভুল করে, সামান্য তিরস্কারে চোখে জল আসে—তবু করতে হয়। কিন্তু তাতেই বা কি হয়? এক জায়গায় আট টাকা, এক জায়গায় ছ'টাকা, ঠিকে চাকরী এই দুটো করতেই তার দিন কেটে যায়, অথচ তাতে চারটি প্রাণীর একবেলাও চলে না। হাত পা হাজায় পচে ওঠে, প্রতিদিনের গায়ের ব্যথা মরবার আগেই রাত পুইয়ে যায়, আবার যেতে হয় কাজে। দেহ বয়না তবু যেতে হয়—নইলে বুড়ো মা আর বাচ্ছা দুটো মরে যে!

এই সময়ে—এ জীবন যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, তখন একই সঙ্গে এল মন্বন্তর আর হারাণ। হারাণ ড্রাইভারের চাকরী করত, মিলিটারী চাকরী নিয়ে সরবরাহ বিভাগে কাজ পেয়েছিল। ওর বন্ধুত্ব ছিল জীবনের সঙ্গে, সেই সূত্রে সামান্য আলাপ ছিল—সাহায্য করবার নাম ক'রে এই সময়ে যাওয়া-আসা বাড়িয়ে দিলে সে। সাহায্য সে যা করত তাতে বিশেষ কিছু হ'ত না, তবু সেটুকুও ছাড়া যায় না, তখন এমন অবস্থা। তাই ওর মতলব ভাল নয় বুঝেও রতন ওকে "এসোনা" বলতে পারেনি। সেই দুর্ব্বলতারই সুযোগ নিলে হারাণ। প্রস্তাব করলে যে যদি রতন তার সঙ্গে গিয়ে আলাদা বাস করে তাহ'লে ওর ছেলেমেয়ে এবং মাকে বাঁচাবার মত নিয়মিত মাসিক সাহায্য সে করবে। কিন্তু ছেলেমেয়েকে রেখে যেতে হবে মায়ের কাছেই—ওদের নিয়ে হারাণ ঘর করতে পারবে না।

চতুর্দোলা

ঈশ্বর জানেন, তবু রতন রাজী হয়নি প্রথমে। কিন্তু চাল যখন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় উঠলো; ক্যান্টিনের খিচুড়ী খেয়ে ছেলেমেয়ে দুটোরই পেট ছেড়ে দিলে, মায়ের চেহারা অনাহারে হয়ে উঠল কঙ্কালসার—তখন আর রাজী না হয়ে পারল না। হারাণ চুরী ক'রে চাল-ডাল-ঘি-চিনি এমন কি সিগারেট পর্য্যন্ত আনে, তার হাতে তখন বিস্তর পয়সা। সে বুড়ীকে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা ক'রে দিতে রাজী হ'ল—উপরন্তু কিছু চাল ডাল, কিন্তু ঐ এক কথা—সে বা ছেলেমেয়ে যেন ওদের ছায়া না মাড়ায়!

তাই হ'ল। ওদের পাড়া থেকে অনেক দূরে, এই সহরতলীর প্রান্তে ছোট বাড়ী ভাড়া ক'রে ওকে তুললে হারাণ; দেবতার জায়গায় বসাতে হ'ল বানরকে। অপমানে, ঘৃণায় ওর মরে যেতে ইচ্ছা হ'ল তবু যে মরতে পারল না—সে ঐ গোপালদেরই মুখ চেয়ে। কিন্তু ওদের স্নেহে যে ওদের এমন একান্তভাবে ত্যাগ করতে হবে তা কি ও স্বপ্নেও ভেবেছিল! হারাণ যে এমন নির্ম্মম হবে তা আগে কিছুতেই বোঝা যায়নি—যেমন জানা যায়নি যে ও মদ খায়, সুযোগ পেলে গাঁজা খায়! জীবন রতনকে কোনদিন একটা গালাগালি দেয়নি—হারাণের হাতে মার খেতে হ'ল ওকে। তার ওপর সত্যি সত্যিই কোনদিন ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেয় না! ছ'মাস তাদের না দেখতে পেয়ে পাগলের মত হয়ে ও হারাণের পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছিল, তাতেও হারাণের মন গলেনি। শেষে রতন যখন ভয় দেখালে যে সে ওকে ফেলে ছেলেমেয়ের কাছেই ফিরে যাবে—না হয় ওদের হাত ধরে পথে পথে ভিক্ষা করবে তখন হারাণও হঠাৎ ওর গায়ে হাত দিয়ে শপথ করলে যে তা যদি রতন করে তাহ'লে হারাণও যেখান থেকে হোক ওদের খুঁজে বার করে ওর সামনে গোপালকে আর খুকীকে কেটে দুখানা ক'রে ফেলবে! তাতে যদি ফাঁসি হয় ত হোক!

কথাটা মনে পড়লে আজও ওর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে। এই ক' মাস

হারাণের সঙ্গে ঘর ক'রে ওকে চিনতে পেরেছিল ভাল করেই। হারাণের অসাধ্য কিছুই নেই, তার প্রাণের মায়া কম। চুরি-ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কোনটাই তার কাছে এমন কিছু একটা ভয়ঙ্কর কাজ নয়। তার রতনের প্রতি টানটা যত আন্তরিক তত আন্তরিক ঐ শিশু দুটোর প্রতি বিদ্বেষ। তার কেবলই মনে হ'ত যে ওরাই রতনের মনকে তার কাছ থেকে চুরি করে রেখেছে—নইলে সে ভালবাসতে পারত হয়ত হারাণকেও।

শেষে একদিন গোপালই এল ওর কাছে, গোপনে। আট ন' বছরের ছেলে মাকে হারিয়ে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে— সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছে মায়ের ঠিকানা—কেউ বলেনি। শেষে এতদিন পরে কি ক'রে খুঁজে পেয়েছে সে।···তাকে জড়িয়ে ধরে রতন সেদিন যত কেঁদেছিল পৃথিবীতে সৃষ্টির পর থেকে কোন নারী বোধ হয় সন্তানের জন্য অত কাঁদেনি।

কিন্তু সেদিন ছিল হারাণের সকাল বেলা ডিউটি! দুপুরবেলা সে এমন হঠাৎ এসে পড়ল যে রতন কোন রকম প্রস্তুত থাকবার সুযোগ পেলে না। চোরের মার খেতে হ'ল গোপালকে—ঐটুকু বালককে প্রায় আধমরা করে রাস্তায় বার ক'রে দিয়ে বলে দিলে, 'খবরদার! এর পর যদি কোন দিন আসবার চেষ্টা করিস্ ত বাকী প্রাণটুকুও শেষ ক'রে দেব। সাবধান!'

পাড়ায় যারা থাকত তারা পরে "ছি ছি" করলে কিন্তু তখন কেউ ঐ দুধের বালককে বাঁচাতে এগিয়ে এলোনা।

কিন্তু তবু গোপালের আসা বন্ধ করতে পারেনি। সে লুকিয়ে লুকিয়ে আসত। নন্দরাণীর কুটুম থাকে গোপালদের পাড়ায়, তাকে দিয়েই খবরাখবর চল্‌ত দুজনের, সুযোগ সুবিধা পেলে অন্ধকারে লুকিয়ে আসত গোপাল, দু'পাঁচ মিনিট থেকে চলে যেত। ঘন ঘন আসা সম্ভব হ'ত

না—যদি পাড়ার লোক কেউ টের পেয়ে হারাণকে বলে দেয় এই ছিল ভয়। এম্‌নি ত সন্দেহ ক'রেই মধ্যে মধ্যে মারধোর করে হারাণ।

তারপর এল ওর অগ্নি-পরীক্ষা। নন্দরাণীর মারফৎ-ই খবর পাওয়া গেল খুকীর অসুখ—টাইফয়েড। বোধ হয় বাঁচবে না। নন্দরাণীকে দিয়েই লুকিয়ে কয়েকটি টাকা পাঠিয়ে দিলে, শেষ পর্য্যন্ত একটা ছোট গয়নাও—কিন্তু তবু দেখতে যাবার অনুমতি পেলে না। হারাণের সেই এক গোঁ—এক কথা, 'তোর সামনেই তাহ'লে তোর ছেলেকে দুখানা ক'রে কেটে থুয়ে আসব। মা কালীর দিব্যি, গুরুর দিব্যি তোকে ব'লে রাখলাম।'

এরপরে আর সাহসে কুলোয়নি। মেয়ে মরে গেল, তাও দেখা হ'ল না শেষবারের মত। ঘরের মেঝেতে মাথা কুটে আছড়ে কেঁদেছিল রতন, গলায় দড়ি দিয়ে এ ঘৃণিত কলঙ্কিত জীবন শেষ করতেও গিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারেনি ঐ গোপালের মুখ চেয়েই। ছেলেটা হয়ত না খেয়ে মরে যাবে, রতন মলে কি আর হারাণ ওদের দেখবে? কখনই না! হয়ত—এক এক সময় মনে হয়—হারাণকে খুন ক'রে ও যদি গলায় দড়ি দেয় তাহ'লে এ পাপের, এ অনাচারের, এ নিষ্ঠুরতার কিছু শোধ নেওয়া হয়। কতদিন ঘুমন্ত হারাণের মুখের দিকে চেয়ে এ কথা ভেবেছে সে—দুটো কারণে পারেনি। প্রথমতঃ গোপাল আর মা, তারা কি খাবে এই চিন্তাটা মনে এসেছে, দ্বিতীয় কারণটা লজ্জার, কিন্তু তবু অস্বীকার করা যায় না—হারাণকে খুন করতে ওর হাত উঠবে না। হারাণ সব ছেড়েছে, বাড়ী-ঘর আত্মীয়-স্বজন সব, ওর জন্যই তাতে ত সন্দেহ নেই। ওর জন্যই আজ পর্য্যন্ত সে রতনের মায়ের কাছে প্রতি মাসে ত্রিশটি টাকা পৌছে দেয়। সে ভালবাসার কথাটা মনে মনে মেনে না নিয়ে পারে না রতন—অন্যায় হয়ত করেছে সে, তবু—সে ত রতনেরই জন্য!

মস্‌মস্‌ ক'রে সামনের রাস্তাটায় জুতোর শব্দ উঠল। হারাণ ফিরছে রতন তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে, চোখে জল দেখলেই কারণটা বুঝতে বাকী থাকবে না হারাণের—আর তা হলেই বকাবকি, গালাগাল শুরু হবে। আজকাল হারাণের অন্য সন্দেহও বেড়েছে, ওর কেবলই ভয় আর কেউ রতনকে হাতছাড়া ক'রে নেবে। সেজন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয়—

হারাণের গলা শোনা গেল বাইরে থেকে, 'আ মরণ, আলো জ্বালেনি কেন? আলো জ্বাল্‌।'

তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনটা জ্বালে রতন। একটা ছোট চিনির বস্তা ধপাস্‌ ক'রে মেঝেতে ফেলে হারাণ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। তারপর বললে, 'চোখে জল কেন?—কান্না হচ্ছিল বুঝি? কার মুখে খবর এসে পৌঁছল? পাড়ার দূতগুলি জুটেছে ভাল!'

'কি খবর?' আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে রতন।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোতে মুখটা ভাল করে দেখা যায় না। তাই বিস্ফারিত-নেত্রে সন্দিগ্ধভাবে হারাণ চায় ওর মুখের দিকে। সবটা অভিনয় কিনা বুঝতে পারে না।

রতন হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল এবার, 'ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কার কি হয়েছে বলো।······তুমি মানুষ না কি গো? গোপালের কি অসুখ করেছে?'

রতন সত্যি-সত্যিই ওর পায়ে ধরতে গেল। হারাণ আস্তে আস্তে পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে কঠিন-কণ্ঠে শুধু বললে, 'হুঁ!'

তারপর ধীরে-সুস্থে পোষাক ছেড়ে কলতলার দিকে চলে গেল, যাবার সময় উঠোন থেকে চেঁচিয়ে বললে, 'চা কর্‌।'

রতন চোখের জল মুছে উঠে বসল। আজ মদের গন্ধ নেই মুখে, কোথা থেকে শুধু গাঁজা খেয়ে এসেছে—আজ কিছুতেই ওকে নরম করা যাবে না তা সে জানত। তবু খবর ওর চাই-ই আজ গোপালের, আজ ওকে মেরে ফেললেও নড়বে না। এমন ক'রে বেঁচে লাভ নেই, যা হয় হবে।

কলতলা থেকে স্নান করে ভিজে মাথাতেই ঘরে এসে দাঁড়াল হারাণ।

'কৈ—উঠলি না? জল চাপিয়েছিস চায়ের?'

'না। তুমি আজ গোপালের খবর না দিলে আমি কিছুতেই উঠ্‌ব না।'

'হুঁ।' দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলে হারাণ, 'মরণ-বাড় বেড়েছে তোর, বুঝেছি। চুলের ঝুঁটি ধরে ঘা-কতক না দিলে চৈতন্য হবে না!'

অকস্মাৎ নিরীহ রতনের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখ বারবার মরণের ভয় দেখিও না। মরতে আমিও জানি—শুধু গোপালের জন্যই ত আমার বেঁচে থাকা—সেই গোপালই যদি যায় তাহ'লে কিসের ভয় আমার! মরতেও পারি, মারতেও পারি—আমি নড়ব না এখান থেকে, কি করবে করো—'

সে মুখের চেহারা হারাণের অপরিচিত। কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে সে বললে, 'আ মুখে আগুন তোমার, গোপালের কি হয়েছে কি? গোপালের কথা কে বলেছে? বুড়ী হঠাৎ দাওয়া থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে। আমি বলি সেই খবর পেয়েই—তাহলে ও কান্নাটা কিসের হচ্ছিল?'

আবার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে হারাণ। ম্লান আলোতে ওর মুখটা দেখবার চেষ্টা করে।

কিন্তু রতন আর দাঁড়াল না। চোখ মুছতে মুছতে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। মায়ের পা ভেঙেচে শুনে সে যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল অর্থাৎ গোপালের কিছু হয়নি এইটিই যে তার কাছে সেই

মুহূর্ত্তে বড় হয়ে উঠেছিল, এজন্য সে লজ্জিত। বেচারী মা, তার জন্য কত লাঞ্ছনাই সইছে, এমন বিপদে কে যে মুখে একটু জল দেয় তার লোক নেই। গোপালই বা কি খাবে কে জানে, কে রেঁধে দেবে তাকে।

সজ্জিত অন্নব্যঞ্জনের দিকে চেয়ে রতনের দুই চোখ জ্বালা করে জল আসে। প্রতিদিনই তার মুখের ভিতর গিয়ে সুখাদ্য সব বিষিয়ে ওঠে এমনি ক'রে—বুভুক্ষু সন্তানের মলিন মুখ যখন মনে পড়ে।

অনেক রাত্রে কি একটা শব্দ পেয়ে রতনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে জেগেই ছিল বহুক্ষণ, রাত বারোটারও পর বোধ হয় তার তন্দ্রা এসেছে। কি একটা যেন ধপাস ক'রে পড়ল।

কিন্তু তার আচ্ছন্ন চৈতন্যের মধ্যে কথাটা ভাল করে পৌছবার আগেই একটা হৈ হৈ উঠ্‌ল পাশের বাড়ী থেকে "চোর! চোর!" সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের বাড়ী, এধারে নন্দদের বাড়ী থেকেও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল— 'চোর—চোর! হারাণদা! হারাণ! চোর এসেছে, চোর!'

হারাণ এক লাফে বিছানা থেকে নেবেই দোর খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। 'কি হয়েছে হে ফকির?'—হাঁক দেয় হারাণ।

"চোর এসেছে হারাণদা, তোমাদের বাড়ীতেই উঠছিল পাঁচিল বেয়ে। ঐ যে মোহনলাল ধরেছে ওকে—এস এস বাইরে এস।"

পাগলের মত বেরিয়ে যাচ্ছিল রতন—এক ধাক্কায় তাকে ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে হারাণ দোরে শেকল তুলে দিলে। ব্যাপারটা সেও আগেই অনুমান করেছিল, বোধ হয় রতনেরও আগে—

পাঁচ ছ'জনের জটলার মধ্যে গোপাল দাঁড়িয়েছিল শুষ্কমুখে। চড়, লাথি গাঁট্টা ইতিমধ্যেই পড়েছে তার উপর—কিন্তু সে কাঁদেনি, একটা কথাও উচ্চারণ করেনি, মায়ের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেনি। সে যে মায়ের সঙ্গে

দেখা করতেই এসেছিল, দিদিমার অবস্থা খারাপ দাঁড়িয়েছে এ খবরটা যেমন ক'রে হোক মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্তই সে যে পাগলের মত এমন কাজ করতে গিয়েছিল—অপটু হাত-পা শেষ পর্য্যন্ত ঠিক পাঁচিল বেয়ে উঠতে পারেনি, হঠাৎ ফসকে পড়ে গিয়েছে, এ সব একটি কথাও সে বললে না, শুধু হারাণকে দেখে অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

হারাণের মুখে চোখে একটা ক্রূর এবং হিংস্র আনন্দ ফুটে উঠেছিল, সে গলার সুরে ব্যঙ্গ টেনে এনে বললে, 'এই যে. এই বয়সেই এ সব রপ্ত হয়েছে —বা, বেশ ! বেশ ! হবে না, কী ঝাড় !"

ফকির অবাক্ হয়ে বললে, "একে চেনো নাকি হারাণদা ?"

হারাণ ঢোঁক গিলে বললে, "ওর বাপকে চিনতুম। যেমন বাপ তেমনি বেটা ! দাও না দু'চার ঘা, দাঁড়িয়ে আছ কেন সব ? মারই ওর ওষুধ !"

সে নিজেও দিলে একটা চড়, মাথা ঘুরে পড়ে গেল গোপাল, ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল।

তারপর শুরু হ'ল আর এক দফা কীল-চড়-লাথি। হারাণ আর মারেনি, সে কান পেতে শুনছিল বন্ধদ্বারের মধ্য থেকে রতনের কান্না—আর দোরে মাথা খোঁড়ার শব্দ !

গোপাল যখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে এসেচে—ভীড়ের মধ্য থেকে কে বললে, 'ওকে অত মেরো না হে, একেবারে বাচ্চা !···বরং পুলিশে দাও—'

কিন্তু কি ভেবে হারাণ বললে, 'থাক থাক পুলিশে দিতে হবে না।—দাও, এমনি দু'চার ঘা দিয়ে ছেড়ে দাও—'

ইতিমধ্যে নন্দরাণী বেরিয়ে এসেছিল, সে ভিড় ঠেলে এই সময় এগিয়ে এসে বললে, 'ওমা—এ যে গোপাল, রতন দিদির ছেলে ! আহা বাছারে, বুঝি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল লুকিয়ে—পড়ে গেছে। বাছা আমার, ষাট ষাট !'

উগ্র হিংস্রতায় হারাণের মুখচোখ বীভৎস হয়ে উঠল। সে মুখ ভেঙ্গিয়ে বললে, 'হ্যাঁ দুপুর রাতে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল! চোরের ঝাড়! খেতে দিই কিনা, তাই আমারই চুরি ক'রে শোধ দিচ্ছিল।' কিন্তু সংবাদটা শোনবার পর সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, হারাণ কোথাও থেকে কোন অনুমোদন পেলে না—আর সেটা সে সকলকার হঠাৎ-থমথমে ভাবে নিজেও বুঝতে পারলে।

চেঁচিয়ে উঠ্‌ল শুধু নন্দরাণী, 'থামো থামো! তুমি মুখ নেড়োনি বাপু, তুমি যা পিশেচ, এ পাড়ার কেনা জানে তোমাকে? দুধের ছেলেটাকে দেখা করতে দাও না মায়ের সঙ্গে, মেয়ে ম'রে গেল তা একবার দেখতে দিলে না! ...রতন দিদিমণি ভাল মানুষ তাই, পড়তে আমাদের মত মেয়ের পাল্লায় ত নাক কেটে ছেড়ে দিতুম।'

কী জানি কেন, হারাণ আর আস্ফালন করলে না—বরং চারপাশের নিঃশব্দ তিরস্কার থেকে আত্মগোপন করবার জন্য বাড়ীর ভেতর ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে।

উপার্জ্জন

যদিও ট্রেণটা ফেল হয়ে গেল এবং স্টেশন মাষ্টার জানিয়ে দিলেন যে কাল সকালের আগে আর কলকাতায় যাবার গাড়ী নেই, তবু হরকুমার একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসই ফেললে। যাক্‌গে ট্রেণ—অত ছুটোছুটির তার দরকারই বা কি? না হয় একটা দিন গেলই।

হরকুমার স্টেশনের বাইরে এসে বেশ প্রসন্ন মুখেই চারদিক তাকালে। আজ তার সবই ভাল লাগছে। সত্যিই, আর তার কোথাও কোন তাড়া

নেই—তার কাজ এক রকম শেষ হয়েছে, পুরস্কারও সে পেয়েছে মোটা। এক সময় ছিল, যখন তার উদ্বেগ দুশ্চিন্তার সীমা থাকত না এমন করে গাড়ী ফেল হ'লে, কিন্তু আজ সে নিশ্চিন্ত। মাটি তৈরী করা, বীজ বপন থেকে শুরু করে বৃক্ষ পালন পর্য্যন্ত তার সব কাজ সারা হয়ে গেছে, এমন কি ফল-শুদ্ধ তার গৃহজাত হয়েছে, বাকী আছে শুধু ভোগ—তাতে তাড়া কি? ধীরে সুস্থে করলেই হবে।

অবশ্য কাজ যে করবার নেই তা নয়, অনেক টাকাকে কি আর আরও অনেক করা যায় না! খুবই যায়, কিন্তু সে ইচ্ছে তার আদৌ নেই। ওর মনে মনে বরাবরই সম্পদের একটা সীমারেখা টানা ছিল, কল্পনার সে সীমাকে বাস্তব যখন ছাড়িয়ে গেছে তখন আর দরকার কি! এই যুদ্ধ যখন বাধল তখন সবাই বলাবলি করেছিল যে বাতাসে টাকা উড়বে এবার, যে ধরে নিতে পারবে সেই বড়লোক। কথাটা তখন বুঝতে পারেনি হরকুমার। ওর ছোট মুদিখানার দোকানে বসে তামাক খেতে খেতে পাঁচজনকে ডেকে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করত। ইস্কুল ছেড়ে ও চাকরী করতে যায়নি—চাকরী যত মোটাই হোক্, আয় যে তার সীমাবদ্ধ, তা হরকুমার জানত। তাই ছোট ভাইকে নিয়ে কলকাতার সহরতলীতে ও অল্প বয়সেই মুদিখানার দোকান খুলেছিল। পাড়ার লোকে বলাবলি করত, 'বামুনের ঘরের গরু—মুদিখানার দোকান খুলে ভদ্রলোকের মুখ ডোবালে' কিন্তু তাতে শুধু সে হাসত, কখনও তাতেনি।

যাই হোক—ক্রমশঃ ব্যাপারটা সে বুঝল। যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে সে পাগলের মত দাঁত মাজা] বুরুষ, লেখবার কালি, কাঠের বোতাম এই সব কিনে ঘর বোঝাই করলে—তাতে আয় বাড়ল কিন্তু সে-ও এমন কিছু নয়। মিলিটারী কনট্রাক্টের জন্য ছুটোছুটি ক'রে সামান্য যে সব উচ্ছিষ্ট ওর অদৃষ্টে জুটতে লাগল তাতেও পেট ভরেনা—যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে

হয়, লাভ সে পরিমাণ মেলে না। যাদের টাকার জোর আছে তারা চুপ ক'রে বসে থেকে এর চেয়ে ঢের বেশী লাভ করে—এই ব্যাপারেই। হরকুমার সবই দেখত সবই বুঝত—অথচ কিছু করতে পারত না, শুধু হাত কামড়াত। টাকা তার ঘরে আসছে বটে কিন্তু এত ধীরে, যে সে টাকা কোন কাজে লাগে না।

তারপর এক সময় ভাগ্যলক্ষ্মী হঠাৎ মুখ তুলে চাইলেন—এল পঞ্চাশের মন্বন্তর। তার আভাস পেয়েই হরকুমার ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ছিল, যাহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—না হয় সব যাবে, আবার সেই মুদীর দোকান ভরসা করবে। অবশ্য তা আর করতে হ'ল না। বারো টাকার চাল যখন চল্লিশ টাকায় বিক্রী হ'ল তখনও হরকুমার ছাড়েনি, অল্প লাভে বিচলিত হবার লোক সে নয়। গোপনে ষাট পঁয়ষট্টি, এমন কি সত্তর টাকাতেও বিক্রী করেছে সে চাল। চাল আর লোহা—হঠাৎ যেন হাজার হাজার টাকা সেধে ঘরে আসতে লাগল, না চাইতেই। শুধু তাই নয়, সেই টাকারই পথ ধরে বোধ হয়, কনট্রাক্ট আসতে শুরু হ'ল মোটা মোটা। ধলভূমগড়ে বাঁশ আর গৌহাটিতে খড়, পার্ব্বতীপুরে রেলের লাইন পাতা—কোন কনট্রাক্টেই পিছ-পা হয় না হরকুমার। একটা মানুষ দশটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অন্য কনট্রাক্টররা কুলী পায় না অথচ ওর কাজে লোকের অভাব নেই। তার কারণ ও বরাবরই জানে যে বেশী লোভ করা ঠিক নয়। টাকা যেমন সে পেয়েছে, লোকজনকেও দিয়েছে দুহাতে। সাহেবরা ঠিকাদার হিসাবে তাকেই পছন্দ করতেন বেশী, তার কারণ অসম্ভব শব্দ তার অভিধানে ছিল না। তাঁদের সে প্রীতির সুযোগও হরকুমার কম নেয়নি। একই খড় কাগজে কলমে পুড়িয়ে দিয়ে দুবার সরবরাহ করা হয়েছে, একটা দেওয়াল গাঁথার মজুরী তিনবার বিল করা হয়েছে। তাতে সে নিজে খুশী ছিল, ওপরওয়ালাদেরও খুশী ক'রে

দিয়েছিল—ষাট টাকা দিয়ে হুইস্কীর বোতল কিনে সাহেবদের ঘর বোঝাই করে দিয়েছে সে।

এইখানেই কিন্তু চুপ ক'রে থাকেনি হরকুমার। টাকা যেমন ঘরে এসেছে, তেমনিই খাটিয়েছে সে। বড় জমি এক সঙ্গে কিনে ছোট ছোট প্লটে বিক্রী করেছে। ঠিকাদারীর দৌলতে মাল মসলা যোগাড় ক'রে সে ছোট বাড়ীও তৈরী করেছিল খানকতক, সব কটাই মোটা লাভে বিক্রী হয়ে গেছে। কাগজ, ছাপাখানা, থেকে শুরু ক'রে ওষুধ পর্য্যন্ত, কালো বাজারে কোন ব্যবসাটাই তার ফাঁক যায়নি। তার ফলে আজ সে দশ বারো লক্ষ নগদ টাকা, কলকাতা ও সহরতলীতে অন্তত ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমি এবং খান-আষ্টেক-দশ ভাড়াটে বাড়ীর মালিক। দু'তিন বছরেই এই অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য্য ওর হাতে এসেছে। এছাড়া খুব বড় একটা চলতি ছাপাখানা কিনেছে সে, তার সঙ্গে একটা পেটেণ্ট ওষুধের কারবার। বড় বড় কয়েকটা কোম্পানীতে শেয়ারও কিনে রেখেছে—আর ছুটোছুটি করবার তার দরকার নেই। মুদীর দোকানটা সে ছোট ভাইকে দিয়ে দিয়েছে, তাকে একখানা বাড়ীও ক'রে দিয়েছে। মায়ের পেটের ভাইকে সে দেখেনি এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। ব্যস্—এইবার তার ছুটি।

বাইরে তার যা কিছু ছিল সব আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়েছে, বাকী ছিল এখানকার দেনা-পাওনা মেটানো—আজ তাও শেষ ক'রে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সব চুকিয়ে দিয়েও সাতাশ শ' টাকা নগদ এবং একখানা ষোল হাজার টাকার চেক পকেটে ক'রে ফিরছে সে।

এইবার সে চায় জীবনটা একটু উপভোগ করতে। দার্জ্জিলিঙে, মিহিজামে আর পুরীতেও একখানা করে বাড়ী আছে তার; সে এক মাস ক'রে কলকাতায় আর একমাস ক'রে এই সব জায়গায় কাটাবে—এই তার কল্পনা।

যে দুটো ব্যবসা হাতে রইল তাতে বেশী কিছু করতে হবে না, মধ্যে মধ্যে এসে দেখে গেলেই হবে। পুরোনো কর্ম্মচারী আছে, সবাই বেশ বিশ্বাসী আর পাকা। তাছাড়া বাঙ্গালী কেরাণীরা পুকুরচুরি করতে সাহস পায় না তাও সে জানে।

হরকুমার আর একবার উজ্জ্বল চোখে চারিদিকে তাকালে। সারাজীবন ছুটোছুটি করা আর ভূতের ব্যাগারা খাটা মূর্খের কাজ; পয়সা যদি ভোগ করাই না গেল ত রোজগার ক'রে লাভ কি? সে খাটতে জানে, খেটেওছে। এইবার সমস্ত রকমে উপভোগ করবে সে এই হঠাৎ-পাওয়া সম্পদ। নাই বা হ'ল সে বিড়লার মত বড়লোক। অত পয়সা কী কাজে লাগত তার? বড়জোর খবরের কাগজে নাম ছাপাবার জন্ত কিছু দান করতে পারত—এইত! অপরের ভোগের জন্ত নিজে সারাজীবন খেটে যাওয়ার কোন অর্থ খুঁজে পায় না হরকুমার, নিতান্ত আহাম্মুকি বলে বোধ হয়। ভারতবর্ষটা ভ্রমণ করবে সে—সপরিবারে নয়, মেয়েছেলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সে পছন্দ করে না—একা ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়ে—সঙ্গে শুধু একটা ছোকরা চাকর থাকবে। বিভিন্ন প্রদেশের জলহাওয়া, খাবার এবং স্ত্রীলোক সবই সে পরখ করে দেখতে চায়। সঙ্গে বেশী লোক থাকলে অসুবিধা। এতে তার বড় জোর হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ হবে, হিসেব ক'রে দেখেছে সে! বিলেত যাবার ইচ্ছে নেই—সেখানে নাকি বারোমাসই বর্ষা হয় তা ছাড়া যত পয়সাই তার হোক না কেন সমস্ত পৃথিবীটা দেখা কারুর পক্ষেই যখন সম্ভব নয়, তখন সে চেষ্টা না করাই ভাল। যারা সারাজীবন পয়সাই রোজগার ক'রে যায় তারাও ত পৃথিবী ঘোরবার সময় পায় না। সুতরাং তাতেই বা সুবিধা কি? কখনও যদি আমেরিকা বা জাপান কি ঐ

রকম দেশে যাবার ইচ্ছে হয় ত সে চলেই যেতে পারবে, সে টাকা তার আছে!

ট্রেণ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়াটে গাড়ীগুলো একে একে সরে পড়তে শুরু করেছিল, আবার সেই রাত দশটায় ট্রেণ আসবে কলকাতা থেকে, তখন গাড়ী দরকার। শেষ একখানা গাড়ী হরকুমারের মুখ চেয়ে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, আর থাকতে না পেরে তার গাড়োয়ান হেঁকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী বাবু, গাড়ী চাই নাকি ?'

'গাড়ী ? ন্-না ! গাড়ী চাই না।'

গাড়ী চড়ে সে আর কোথায় যাবে ? কোথাও পৌছবার যখন তাড়া নেই, তখন মিছি মিছি গাড়ী চেপে লাভ কি ? কোথাও রাতটা কাটাতে হবে এই ত ? তা তার জন্যও বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। এ শহরের ডাক বাংলা, হোটেল সবই ওর পরিচিত—তবে ওর সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই নেই, এই যা বিপদ। হোটেল কি ডাকবাংলায় থাকতে হ'লে একটা বিছানা চাই। পূজার পর, এখন প্রথম শীতের সময়—বাইরে হিমে পড়ে থাকাটা খুব আরামদায়ক নয়।

অবশ্য, হরকুমারের ওষ্ঠের প্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল, যে সব স্থানে গেলে বিছানার জন্য ভাবতে হয় না—সে সব বাড়ীত রয়েছেই! সেই বিশেষ পল্লীটা যে এ শহরের কোথায়, তাও হরকুমারের জানা ছিল, বছরখানেক আগে এক পাঞ্জাবী ঠিকাদারের সঙ্গে তাকে আসতে হয়েছিল, যদিও সে বেশীক্ষণ থাকেনি। তখন একটা রাত কোথাও বৃথা কাটাবার কথা হরকুমার ভাবতে পারত না।

আজ গেলে মন্দ হয় কি ? আজই ত সে সম্পূর্ণ ছুটি পেল তার জীবনযুদ্ধ থেকে, এই ত উপযুক্ত দিন। অতঃপর যদি জীবনটা উপভোগ করতেই হয় ত আজ থেকেই শুরু করা যাক না—

হরকুমার একটু নড়ে চড়ে উঠল। গাড়ীটা চলে গেছে বটে, তবে গাড়ীর দরকারও ছিল না—পল্লীটা এমন কিছু দূরে নয়। সে স্টেশন-এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে বাঁদিকের রাস্তাটা ধরলে। এই ভাল, একটা ডেরায় পৌঁছে তাদের দিয়েও হোটেল থেকে কিছু খাবার আনানো চলবে। লুচি কিংবা পরোটা আর মাংস—

এখানে নিজে কখনও আসেনি বটে তবে ঠকবার লোক সে নয়, কোথায় খবর নিতে হয় তা জানে। গলিতে ঢোকবার মুখেই যে চালাটায় চায়ের আর পানের দোকান, সেইখানে পান সিগারেট কেনবার অছিলায় দাঁড়িয়ে খবর নিলে সে। ভাল মেয়েমানুষ? হ্যাঁ, আছে বৈ কি! চেহারা যদি চান ত সুশীলা, একেবারে কাঁচা সোনার রঙ—তবে মানুষ ভাল হচ্ছে আমাদের চাঁদু,ও এ পথে নতুন, বেশী দিন অসেনি, বেশ মেয়ে!

রূপে লোভ নেই হরকুমারের, রাতটা কাটাতে হবে কোথাও, মানুষটাই ভাল হওয়া দরকার। একটু সেবা, দুটো মিষ্টি কথা—ব্যস্! সে সিগারেটটা দড়ির আগুনে ধরিয়ে নিয়ে (দেশলাই বাঁচাবার অভ্যাস এখনও যায়নি তার) মুখ তুলে প্রশ্ন করলে, 'তাহলে চাঁদুর বাড়ীটা কোন দিকে হ'ল ভাই?'

'ঐ যে সোজা গিয়ে ডান-হাতি, টিনের বাড়ী টিনেরই দেওয়াল দেখছেন—হ্যাঁ, ঐটে—'

তা চাঁদু মানুষটা সত্যিই ভাল। খুশী না হয়ে পারলে না হরকুমার। ঘরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদু ওর জুতাটা খুলে নিলে, কোটটা খুলে টাঙ্গিয়ে রাখলে পেরেকে, তারপর ফরসা তোয়ালে ভিজিয়ে মুখ-হাত-পা মুছিয়ে নিয়ে একটা মোটা তাকিয়া এগিয়ে দয়ে বলে গেল, 'আরাম করে বসুন—তামাক খান ত? তামাক সেজে আনি।' চাঁদুকে মোটে বলে

দিতেই হ'লনা যে সারাদিন ঘোরাঘুরির পর একটু বিশ্রাম করতেই এসেছে, কেমন ক'রে যেন চাঁদু নিজেই বুঝতে পারলে। ওর ঘরের আসবাবগুলোও ভাল, এ রকম মফঃস্বল সহরে হরকুমার মোটেই এত পরিচ্ছন্ন ঘর ও পরিষ্কার শয্যা আশা করেনি। পানওয়ালাটা মিছে কথা বলেনি, ভাল সন্ধানই দিয়েছে সে।

তামাক সেজে এনে দিয়ে চাঁদু প্রশ্ন করল, 'চা খাবেন ? চা করব ?'

'চা ?' হরকুমার ওর শ্যামবর্ণের সুশ্রী মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'চা অবশ্য আমি একটু আগেই খেয়েছি, তবু খেতে বাধা নেই, করো একটু। তবে—'তবেটা যে কি, তা হরকুমার ভাঙ্‌লে না। আসলে ও কিছু খেতে চায়। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে তার আগে টাকা বার ক'রে দিয়েই খাবার ফরমাস্ করা উচিত বলে সে চেপে গেল। একেবারে রাত্রের খাবার আন্‌তে দেবে সে—বার বার খাবার আনালে চাঁদু কি মনে করবে।

চাঁদুও 'তবে'র পিছনে কি আছে প্রশ্ন করলে না। ওর ফিরতে একটু দেরিই হ'ল। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে চা আর চারটি চিঁড়ে ভাজা নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল চাঁদু, একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'ঘরে ষ্টোভ থাকলে কি হবে—কেরোসিন নেইত ! গুল জ্বেলে তবে চা করতে হ'ল। এখানে আর যারা আছে, হোটেল থেকে চা আনিয়ে দেয়, আমার সে ভাল লাগে না। হোটেলে যা ছিরির চা !'

ওর আন্তরিকতা এবং যত্নে মুগ্ধ না হয়ে পারল না হরকুমার। বহুদিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহ ওর, সত্যকথা বলতে কি, একটু গৃহসুখই চাইছিল। বেশ্যাবাড়ী এসে সেটা ঠিক বেশ্যাবাড়ীর মত না দেখালে অনেকে হতাশ হয় কিন্তু হরকুমার সে দলের নয়, এখানে এসে হঠাৎ পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস পেয়ে সে খুবই খুশী হয়ে উঠ্‌ল।

আরাম ক'রে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বললে, 'আঃ !···কেরোসিন পাচ্ছনা বুঝি মোটেই ? আচ্ছা, মনে ক'রে দিও যাবার সময়। এখনকার কেরোসিনের

এজেণ্ট যে, সে আমার আলাপী লোক, তাকে একখানা চিঠি দিয়ে যাবোখ'ন, তোমার অন্তত কেরোসিনের অভাব থাকবে না।'

ও যে এই শ্রেণীর যত্নে খুশী হয়েছে তা বুঝতে পেরে চাঁদুরও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাছে এসে বসে হরকুমারের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে এক সময়ে বললে, 'খাবার কি হোটেল থেকে আনাবো না নিজে করব?...করতে আমার একটুও কষ্ট হবেনা। তবে যদি আমার হাতে খেতে না চান তাহ'লে হোটেল থেকে আনাতে হবে—'

'না না, সে কি কথা।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল হরকুমার, 'সে কি কথা। আমরা কোথায় না খাচ্ছি যে তোমার হাতে খাবো না। তা নয়, তবে তোমার কষ্ট হবে বলেই—'

'আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না।' গলায় জোর দিয়ে বললে চাঁদু, 'এই ত সবে সন্ধ্যে, একটু মাংস আনিয়ে নিই। পরোটা আর মাংস সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যেই হয়ে যাবে। উনুনে আঁচ দিই, কেমন?'

আলস্য ও আরামে জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে হরকুমার, 'দাও। মোদ্দা একেবারে আমাকে একা ফেলে রেখে দিও না, মধ্যে মধ্যে কাছে এসে বসো—বসবে ত? এই নাও—'

সে সার্টের পকেট থেকে একটা পাচ টাকার নোট বার ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল চাঁদুর সামনে, তারপর বাকী চা-টুকু এক চুমুকে পান ক'রে নিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে পিঠটা ছড়িয়ে আবার ও একটা আরামের শব্দ ক'রে উঠল, 'আঃ—!'

চাঁদুকে আরও কাছে টেনে এনে হরকুমার বললে, 'সারারাতই দেখছি গল্প করে কেটে যাবে।...রাত ওধারে তিনটে বেজে গিয়েছে।...বেশ লোক কিন্তু

তুমি। মাইরি! খুব ভাল লাগছে তোমাকে, তোমার কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। যেভাবে তোমার সঙ্গে গল্প করে রাত কেটে গেল, মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার বিয়ে করা পরিবার, নতুন বৌ। বিয়ের পর প্রথম প্রথম এমনি কাটত বৌয়ের সঙ্গেও—সে কতকালের কথা, কিন্তু এখনও বেশ মনে আছে আমার, চোখ বুঝলেই চোখের সামনে দেখতে পাই।'

চাঁদু ওর আলিঙ্গনের মধ্যেই যেন শিউরে উঠল। কত কালের কথা বটে, তবে তারও অম্‌নি সব কথাই মনে আছে। চোখ বুজলে এখনও সে সব দেখতে পায়। তার বর কোন্ স্যাকরার দোকানে কাজ ক'রত, আয় সামান্য, দেখতেও এমন কিছু ভাল ছিল না, তবু চাঁদু তাকে সেদিন সত্যিই ভালবেসেছিল। তার সে বরের সঙ্গে সেদিন সে স্বর্গের দেবতাকেও বদল করতে রাজী ছিল না।...মনে আছে, সেও এমনি করে সারারাত গল্প করে কাটিয়ে দিত এক-একদিন, আবার ভোরের দিকে চাঁদুকেই দুষত, বলত, 'বলি এ কাণ্ডটা কি করলে বলো ত? কাল দোকানে গিয়ে কাজ করতে হবে না?—কাজ করবো না ঢুলব?' কিন্তু তার মুখ দেখলে মনে হ'ত সে মোটেই বিরক্ত হয়নি বরং খুশীই হয়েছে।...আজ তার কথা মনে হ'লে লজ্জায় অপমানে ওর যেন মাথা কুটে মরতে ইচ্ছা করে!

হঠাৎ ওর চমক ভাঙ্গল এক সময়। শুন্‌তে পেলে হরকুমার বলছে, 'তোমাদের কি এই অঞ্চলেই বাড়ী? এইখানেই আছ বরাবর?'

'ওমা ছি!' গলায় জোর দিয়ে বলে চাঁদু, 'বাড়ী আমাদের হুগলী জেলায় ছিল। যখন আর উপায় রইল না, এই পথেই পা দিতে হ'ল তখন এখানে পালিয়ে এলুম। অনেক দূর, দেশের লোক কেউ জান্‌তে পারবে না। নিজের দেশে থেকে কি কেউ একাজ করতে পারে?...'

হ্যাঁ, সেদিনের কথা চাঁদুর মনে আছে বৈ কি! ওর বর যখন মারা গেল তখনও শ্বশুর-বাড়ী ছাড়েনি, পরের বাড়ী কাজ করে, ধান ভেনে

ও বুড়ী শাশুড়ীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জিনিষ-পত্রের দাম যখন চড়তে শুরু হ'ল তখন আর সেই সামান্য আয়ে কুলোত না তবু চাঁদু হাল ছাড়েনি—একবেলা খেয়ে, একদিন অন্তর খেয়েও চালাচ্ছিল। জমি জমা বিশেষ কিছু ছিল না কখনই—যেটুকু ছিল অক্ষয়ের অসুখের সময়ে বাঁধা পড়েছিল সব। সেটাও বিক্রী করে দিলে কিন্তু তবু সে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে কতক্ষণ আর সে ক'টা টাকা? তারপর এল পঞ্চাশ সাল—চাল কোথাও নেই—এক মুঠো টাকার বদলে দুমুঠো চাল এই হিসেবে বিক্রী হতে শুরু হ'ল। অত টাকা গতর খাটিয়ে মেলেনা, ভিক্ষে করে এক ঘটি ফ্যানও পাওয়া যায় না। ঘটি-বাটি-কাপড়—যা যেখানে ছিল সব বিক্রী হ'য়ে গেল, তারপর আরম্ভ হ'ল নিরম্ব উপবাস! হয়ত নিজে সেদিন সে উপবাস ক'রে মরতেও পারত, কিন্তু বুড়ী শাশুড়ীর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারেনি সে। শুধু সেই জন্যই ও প্রথম এপথে পা বাড়ায়—এইটুকু ওর সান্ত্বনা। হয়ত ঈশ্বর ওর এই পাপ ক্ষমা করতেও পারেন। গ্রামের হিন্দুস্থানী দোকানদার গোপনে ওকে সের পাঁচেক চাল দিয়েছিল তার বদলে নিয়েছিল ওর ইজ্জৎ—

আর একবার শিউরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হরকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'অমন শিউরে উঠছ কেন বলতো বারবার? শীত করছে?

'না এমনি—'অপ্রতিভভাবে জবাব দিলে চাঁদু।

হরকুমার বললে, 'না, তোমার কাছে এসে বড় খুশী হয়েছি। সম্ভব হ'লে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম কিন্তু দেশে ঘাটে আর এসব করতে চাই না। আমার বউও বড় দজ্জাল। যদি কখনও বাইরে বেরুই তখন তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো—আচ্ছা সে পরের কথা।'

তাড়াতাড়ি সামলে নিলে হরকুমার। আবেগের মাথায় কিছু বলে ফেলা ঠিক নয়, ওতে ঠকতে হয়। নানা অভিজ্ঞতা সে চায়—ঘরের স্ত্রী ত নয় যে একজনকে নিয়েই জীবন কাটাতে হবে।

চাঁদু হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, 'আপনি কি করেন ?'

'আমি ?' হেসে বললে হরকুমার 'আমি করতুম আগে ব্যবসা, আজ থেকে ছেড়ে দিয়েছি। আর কিছুই করব না।'

'তবে ?'

'মানে, তবে চলবে কিসে ? এইত জানতে চাইছ ? চলবে—তার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছি। অনেক টাকা করেছি এই যুদ্ধের বাজারে, বুঝেছ ? অনেক টাকা। আর কিছু রোজগার না করলেও চলবে। দিন যদি ভাল ভাবে চলেই যায়, বেশী খেটে লাভ আছে কিছু ? তুমি কি বলো !'

'তা-ত বটেই' চাঁদু উত্তর দিলে, 'এত টাকা কিসে কিসে করলেন ?'

'এই সব নানারকম ব্যবসা ! তবে বেশী টাকা পেয়েছি গত বছরের আগের বছর চাল বেচে।'

চাল ! আবার সব অপ্রিয় কথা মনে পড়ে যায় চাঁদুর। চাল ! আগে যা সামান্য জিনিষ মনে হ'ত। তারাও কত চাল ভিক্ষে দিয়েছে,—মুঠো—মুঠো ! গরীবের সংসার, কিন্তু কেউ ফিরে যায় নি কোনদিন ওদের দোর থেকে ! চাল ভাত—এ-যে আবার দিতে কষ্ট হয় তা-ই জানা ছিল না। অথচ সেই চালের জন্য কি না করতে হ'ল ! চাঁদুর বাবা, মা, ভাইরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে কলকাতা যাচ্ছিল, কতক পথে মারা গেল, কতক কলকাতা পৌছে। মরবার আগে শেষ দেখা পর্য্যন্ত হ'ল না—হয়ত তাদের দেহগুলোরও সদ্গতি হয়নি, কোথায় খানায় পড়ে পচেছে, নয়ত ডোমে কুড়িয়ে ফেলে দিয়েছে !

সে মরতে পারেনি—বড় যন্ত্রণা ! তাকে ইজ্জত দিতে হয়েছিল, নিজের জন্য যত না হোক্—বুড়ী শাশুড়ীর মুখ চেয়ে আর থাকতে পারেনি। অক্ষয় যে মরবার সময় ওর হাতেই বুড়ো মায়ের ভার দিয়ে গিয়েছিল!···কিন্তু অত করেও শাশুড়ীকে বাঁচাতে পারেনি সে। চাল যখন এসে পৌছল, তখন দীর্ঘ উপবাসে হজম করার শক্তি চলে গিয়েছে তার, ভাত খেতে পারল না।

শাশুড়ী ম'রে পড়ে ছিল ঘরে, দু'দিন সৎকার করার লোক পাওয়া যায়নি, সেই হিন্দুস্থানীটাই লোক ঠিক করে দেয় তার পরে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চাঁদুর মাথা যেন গরম হয়ে ওঠে। সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

'কি হ'ল?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে হরকুমার।

'কিছু না। মাথাটা কেমন করছে, একটু জল দিয়ে আসি।'

হিন্দুস্থানীটাই ওকে রেখে দিতে চেয়েছিল। চাল টাকা সব দেবে ভরসা দিয়েছিল কিন্তু সে প্রবৃত্তি ওর হয় নি। শাশুড়ীকেই যখন বাঁচাতে পারলে না, তখন স্বামীর ভিটাতে বসে পাপ আর সে করতে পারবে না। গ্রামের আর একটি মেয়ে এখানে চলে এসেছিল, এই শহরের নামটা সে জানত। তাই একদিন চলে এল এখানেই। পাপ যদি করতেই হয় সোজাসুজি করাই ভাল।

মাথায় জল দিয়ে এসে বসতেই হরকুমার প্রশ্ন করলে, 'এমন ঠাণ্ডার দিনে মাথায় জল দিয়ে এলে? শরীর কি খারাপ নাকি?'

'না—ও আমার মধ্যে মধ্যে হয়'।

'না, না, ও ভাল কথা নয়। ভাল ক'রে চিকিৎসা করিও।' কণ্ঠে সস্নেহ উদ্বেগ ফুটে ওঠে হরকুমারের। 'টাকাত এখন ভাল রোজগার হবারই কথা তোমার। আর তা'না হলেও ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়ে যাবো'খন—বুঝেছ, ভাল ক'রে ডাক্তার দেখিও।...না তোমার ওপর বড় খুশী হয়েছি, বড় ভাল মেয়ে তুমি।'

চাঁদু আর শুলো না। ওর কাছ ঘেঁষে বসে প্রশ্ন করলে, 'চালের ব্যবসাতে এত লাভ কি ক'রে করলেন?'

হরকুমারের মুখে একটা তৃপ্তি আর গর্ব্বের হাসি ফুটে উঠল। সে বললে, 'চালের দাম যে চড়বে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। বারো টাকায়

চাল কিনে রেখেছিলুম সেই চাল বিক্রী করেছি পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর টাকা পর্য্যন্ত। চল্লিশ টাকায় কিনে ষাট টাকায় বেচেছি। তা-ও হয়েছে! মোদ্দা টাকা যে সে সময় কি করে এসেছে তা ভাবলে আজও অবাক লাগে!'

আবার একটা শিহরণ। একটা শৈত্য যেন চাঁদুর সর্ব্বাঙ্গে বয়ে গেল! যেন এরাই, হয়তে বা এই লোকটাই তার মা, বাবা, ভাই, শাশুড়ী সকলের মৃত্যুর জন্য দায়ী—শত শত গ্রামবাসী, তার অসংখ্য আত্মীয় কুটুম্ব! কি কষ্ট পেয়েই না মরেছে তারা, বাপ-মায়ের মৃত্যু সে চোখে দেখেনি বটে কিন্তু আরও বহু লোককে সে শুকিয়ে মরতে দেখেছে। এখনও যখন একা থাকে সে, মনে হয় ঠিক একা সে নেই, তার আশে পাশে সেই সব কঙ্কালগুলো চলাফেরা করছে, ভাত খেতে বসলে মনে হয় যেন তারা পাতের কাছে ঘিরে এসে বসেছে! তাদের অতি ক্ষীণ নিঃশ্বাসের শব্দ সুদ্ধ সে সময় যেন শুনতে পায়! ······সেই সব শীর্ণ, প্রেতের মত শীর্ণ মূর্ত্তি! একটা পাত্‌লা চামড়া ছাড়া পেটের কাছটায় কিছু যাদের ছিল না, চোখ যাদের খুঁজে পাওয়া যেত না! শেষ মুহূর্ত্তে যাদের মুখে খাদ্য দিলেও যারা খেতে পারেনি—শুধু খেতে পারছে না এই যন্ত্রণায় আকুলি বিকুলি করে যারা মরেছে!

হয়ত হরকুমারের শেষের দিকে একটু তন্দ্রাই এসেছিল হঠাৎ এক সময়ে সে উঠে বসে বললে, 'এই যে দিব্যি ফরসা হয়েছে। আমি যাই, সাড়ে সাতটার ট্রেন, এটা ফেল করলে চলবে না। ···একটু চা চাপাতে পারো?'

'দিচ্ছি আমি চা করে—আপনি মুখে হাতে জল দেবেন ত? বাইরের দাওয়ায় জল গাড়ু সব আছে।'

কেমন যেন শান্ত কঠিন কণ্ঠস্বর চাঁদুর কিন্তু হরকুমারের সেদিকে কান

ছিল না। অত লক্ষ্য করবার কথাও নয় তার! সে হাত মুখ ধুতে বেরিয়ে গেল।

চা খেয়ে, জামা-জুতো পরা শেষ ক'রে হরকুমার পকেট থেকে নোটের গোছা বার করলে, 'এই নাও, কৃপণতা করবনা, পুরো দুশো টাকাই তোমায় দিয়ে গেলুম। কেমন খুশী ত?'

যেন এক পা পিছিয়ে গিয়ে চাঁদু বললে, 'ও টাকাটা আপনি রাখুন। টাকা আমার দরকার নেই—'

একটু বিস্মিত হ'ল, অসন্তুষ্টও হ'ল হরকুমার। বিরক্ত কণ্ঠে বিদ্রূপ এনে বললে, 'কি এ টাকাও পছন্দ হ'ল না? এত টাকা আর কেউ দিত একসঙ্গে? এখানে ত এক টাকা আট আনা রেট। আচ্ছা আরও পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি, কাল অত যত্ন করেছ, আমিও তোমাকে খুশী করব এই প্রতিজ্ঞা—'

'না না, টাকায় আমার দরকার নেই—আপনি যান, যান বলছি—'

সহসা যেন চীৎকার করে উঠ্‌ল চাঁদু, তারপর পাগলের মত, ওর হাত থেকে নোটের গোছাটা টেনে নিয়ে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'বেরিয়ে যান আপনি এখান থেকে, বেরিয়ে যান বলছি!'

হরকুমার যেন একটু ভয় পেয়েই এক লাফে নীচে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কে জানে পাগল কিনা, কী ক'রে বসবে তার ঠিক কি! সে আর দাঁড়াল না—সোজা স্টেশনের পথই ধরলে। শুধু যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে দেখলে চাঁদু তখনও সেই নোটের টুক্‌রো গুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে আরও ছোট ছোট করে ছিঁড়ছে!

শিবদাসবাবু ঘাড় গুঁজে একমনে লিখে যাচ্ছিলেন। অনেকদিন পরে উৎসাহ এসেছে তাঁর গল্প লেখায়—নতুন ক'রে তাঁর পুরাতন প্রেরণাকে যেন ফিরে পেয়েছেন। তাই কলম চলছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ছোট ছোট সুসম্বদ্ধ অক্ষর-সমষ্টিতে ভরে উঠেছে। আজ আর তাঁর কোন দিকে মন নেই।

এ যেন সত্যিই এক অভিনব ব্যাপার। শিবদাসবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। কথা-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি আজ শরৎচন্দ্রের খ্যাতিকে অতিক্রম না করুক, তাঁর কাছাকাছি পৌঁচেছে। একথা, এমন কি নিন্দুকেও স্বীকার করবে। তাঁর একটি ছোট গল্প আজ শতাধিক মুদ্রা খরচ করলেও পাওয়া যায় না—তাঁর উপন্যাসের চাহিদা সব চেয়ে বেশী। তিন মাসের বেশী সময় লাগে না একটি সংস্করণের এগারো শো কপি ফুরোতে।

কিন্তু খ্যাতি তাঁর যত বেড়ে উঠেছে, যশের শিখরচূড়া ধীরে ধীরে যেমন অভ্রংলিহ হয়ে উঠেছে, তেমনিই তাঁর সমস্ত উৎসাহ কমে এসেছে সাহিত্য-রচনায়। আজকাল আর লেখায় তিনি সে রকম আনন্দ পান না যেমন পেতেন আজ থেকে পনেরো বছর আগে, তাঁর প্রথম যৌবনের দিনে। যশ আর অর্থ যতই অযাচিত এবং অবারিতভাবে পেয়েছেন, ততই তাঁর মনে হয়েছে তাঁর অন্তরের সে কবি, শিল্পী উপবাসী থাকছেন, অন্তর্যামী ক্লান্ত, ক্লিষ্ট হয়ে উঠছেন। অথচ উপায়ও নেই—খ্যাতি ও অর্থের নেশা তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে বৃহত্তর খ্যাতি ও অধিকতর অর্থের দিকে। সে

অবিশ্রাম গতি থেকে তিনি অব্যাহতি পান নি। সার্থকতার সেই কষ্টকর তপস্যা থেকে ছুটি নেওয়া আর তাঁর সম্ভব হয়নি।

অথচ, তাঁর আত্মার আনন্দের এ সমাধি তিনি নিজে হাতেই খনন করেছেন। একদিন কুক্ষণেই, যখন তাঁর অনেকগুলি ভাল ভাল গল্প (তিনি জানেন, এখনও তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস সেই গল্পগুলিই ভাল। মানব মনের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনার ওপর তাদের ভিত্তি, তাদের মূল্য এই সমস্ত লেখার চেয়ে কম তা তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন) ছাপা হবার পরও দেশবাসীর কাছ থেকে স্বীকৃতি পান নি তখন এই সস্তা হাততালির পথে পা বাড়িয়েছিলেন, দেশের ও দেশবাসীর সমস্যাকে করেছিলেন তাঁর কথা-সাহিত্য-রচনার বিষয়বস্তু। জনসাধারণের স্বদেশপ্রীতির সুযোগ নিয়ে দু' চারটে গরম কথা লিখে আসর জমানো, এতে তাঁর মন কোন দিনই সায় দেয়নি, এর ভেতরে যে একটা বড় রকমের ফাঁকি রইল, একদিন যখন দেশবাসীর মনে এ উত্তাপ আর থাকবে না, তখন সে ফাঁকি ধরা পড়বেই, আজ যাকে গগনচুম্বী প্রাসাদ বলে মনে হচ্ছে তা যে একদিন তাসের বাড়ীর মতই ভেঙ্গে পড়বে তা তিনি জানতেন; এবং সেদিন প্রতিশোধ বাসনাই তাঁর মনে উগ্র হয়ে উঠেছিল—যে সম্পাদকের দল তাঁর ভাল ভাল রচনাগুলি ছেপে খুবই অনুগ্রহ করলেন এই ভাব দেখাতেন, তাঁরাই একদিন ভিক্ষার্থী হ'য়ে তাঁর দোরে গিয়ে দাঁড়াবেন —কল্পনায় এ দৃশ্য তাঁর মনে নেশার সৃষ্টি করেছিল বোধ হয়, তাই তিনি সেদিন অগ্রপশ্চাৎ কিছুই ভাবতে পারেননি। জেনেশুনেই সহজ এবং মূল্যহীন সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তারপর আর ফিরে আসা তাঁর সম্ভব হয়নি। যশের এমনিই মাদকতা, অর্থের এমনই লোভ যে সেই হাততালির দিকে কান পেতেই একটির পর একটি রচনা শেষ করেছেন তিনি—চিরস্থায়ী কিছুতে হাত দিতে তাঁর সাহসেই

কুলোয়নি। এমন অনেকবার হযেছে, কোন কোন রচনায় হয়ত গরম কথা কিছু লেখেননি, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের নরনারীকে তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকা করেছেন, তাদের মানসিক দ্বন্দ্বকেই করেছেন রচনার উপজীব্য—অমনি দেখেছেন প্রকাশকদের মুখে অসন্তোষের ছাপ ফুটে উঠেছে, সম্পাদকের দল আড়ালে বলাবলি করেছেন, 'শিবদাসবাবু এবার ফাঁকি দিচ্ছেন।'

একথা তাঁকে এরকম ক্ষেত্রে প্রত্যেকবারই শুনতে হয়েছে—তা তিনি যত যত্ন করেই লিখুন না কেন!

হযত তাঁর আধুনিক রচনাকে যতটা মূল্যহীন তিনি মনে করেছেন অতটা নয় —হয়ত এতেও চিরন্তনত্ব কিছু রইল, অমর না হোক দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবে তাঁর খ্যাতি এসব রচনাতেও—কিন্তু মন তাঁর কিছুতেই বোঝে না যেন, মনে হয় মানুষের শাশ্বত ব্যথা-বেদনার কথা থাকছে না এতে, চিরকালীন মানব মন একে সাহিত্য বলে কোনদিনই স্বীকার করবে না।

তাই আজ বহুদিন পরে মনের মত বিষয়বস্তু পেয়ে এত আনন্দ হয়েছে তাঁর। ইদানীং লেখার কথা মনে হলেই যে বিরক্তি ও ক্লান্তি অনুভব করতেন তার যেন আজ কোন চিহ্নই নেই। কোন সম্পাদককেই তিন চারটে তারিখ না ফিরিয়ে তিনি আজকাল লিখতে বসেন না, সাহিত্য রচনা এমনিই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। অথচ আজই একটি কাগজের মালিকের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে এখনই তিনি সেই গল্প লিখতে বসেছেন—এ যেন নিজের কাছেও এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! তার কারণও অবশ্য আছে—বহুদিন পরে এই মালিক নিজে থেকে অনুরোধ করেছেন, 'মশাই আপনি যে এককালে রোমান্টিক গল্প লিখতেন তা যেন সবাই ভুলে গেছে। আর একটা লিখুন না বেশ জুত ক'রে। আপনারও একটু মুখ বদলানো হবে, পাঠকদেরও চমক লাগিয়ে দিতে পারব।'

বলা বাহুল্য শিবদাসবাবু তৎক্ষণাৎ রাজী হয়েছেন। এ লেখার জন্য টাকা না দিতে চাইলেও বোধ হয় তিনি এমনি উৎসাহভরে লিখতে বসতেন। বাড়ী

এসে কারও সঙ্গে কথা কননি বিশেষ, এক পেয়ালা চা খেয়েই কাগজ কলম নিয়ে বসে গেছেন। মধ্যে একবার এগারোটা নাগাদ খেতে গিয়েছিলেন সেই যা মিনিট দশেক ছেদ পড়েছে, তারপরই আবার বসেছেন—আর এখন রাত সাড়ে বারোটা। এর ভেতর কোন কথা তাঁর মনে ছিল না, কোন দিকে তাকাননি পর্য্যন্ত। এমন কি সিগারেট খেতেও যেন ভুলে গেছেন। খাবার সময় স্ত্রী কী সব বলেছিলেন, তাঁর একটা বর্ণও তার মাথায় ঢোকেনি এতই মশগুল হয়ে আছেন তিনি নিজের গল্পে। অনেক দিন পরে হ'লেও উৎসাহে ও উত্তেজনায় গল্পের কাঠামো তাঁর মাথায় এসেছে রাস্তায় আসতে আসতেই। শুধু তাই নয়—আগেকার দিনে প্রণয়মূলক গল্পের যে একটি প্রকাশভঙ্গী ছিল তাঁর নিজস্ব, এতদিনের অব্যবহারেও তা তিনি একেবারে ভুলে যাননি, রচনাশৈলীর সেই বিশিষ্ট কৌশলটি আজও তেমনি আযত্ত আছে, আর তাতেই তাঁর আনন্দ এত বেশী।

শিবদাসবাবু পাতা উল্‌টে দেখলেন, বড় প্যাডের সাতখানা স্লিপ এরই মধ্যে লেখা হয়ে গেছে। ছোট ছোট অক্ষর তাঁর—ছাপালে অনেকটা দাঁড়াবে। আজকাল সাধারণত এতটা লিখতে তিন দিন সময় লাগে। এখনও হয়ত চমক ভাঙ্গত না—একেবারে গল্প শেষ করেই থামতেন তিনি, যদি না নীচে থেকে একটা চেঁচামেচির শব্দ কানে আসত। গৃহিণী চাকর-বাকরদের সঙ্গে বকাবকি করছেন বোধ হয়—এখনও তাঁর সংসারের পাট মেটেনি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি আবার কাগজের ওপর ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ এই ছেদটা পড়ে কোথায় যেন সুর কেটে গেছে, মনের মধ্যে ঠিক সে আবহাওয়াটি আর ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না কিছুতে। ততক্ষণ লেখবার পর এই প্রথম তাঁর মনে হচ্ছে যে, বড় অসময়ে এই কাহিনী লেখবার ডাক পড়েছে ; তাঁর জীবনে যখন আর কোথাও

কোন রোমান্স নেই—সবটা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে, তখন গল্পের মধ্যে ভাষার মার-প্যাঁচে বসে বসে সেই জিনিস ফেনানো—এ যেন নিতান্তই অদৃষ্টের পরিহাস ! বরং তার চেয়েও বেশী—

অথচ একদিন তাঁর জীবনে সত্যই রোমান্স ছিল, অক্ষরগুলোর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন শিবদাসবাবু, জীবনে সত্যি সত্যিই ছিল রং। প্রথম যৌবনের স্বপ্নময় দিনগুলিতে তিনি তাঁর কল্পনা-মতই জীবনসঙ্গিনী পেয়েছিলেন—কবির ভাষায় বলতে হয় তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মানসীকে। তখন তিনি গল্প লিখতে বসলে রমা তাঁর পায়ের কাছে বসে তন্দ্রারক্ত চক্ষু ওঁর মুখের ওপর মেলে জেগে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে প্রেমবিহ্বল মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চেয়ে গল্প যেন আপনিই আসত ওঁর কলমের ডগায়। মনে আছে, এক-একদিন যখন শুয়ে শুয়ে লেখবার ইচ্ছে হত তাঁর, তিনি রমাকে বলতেন পেছন থেকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে—তার পরিপূর্ণ কৈশোরের উত্তাপ আবেগের অগ্নিসঞ্চার করত তাঁর অনুভূতি ও কল্পনার সমস্ত সত্তায় ! তখন প্রতিদিন একটি করে গল্প লিখেও তাই তিনি ক্লান্ত হননি—কিংবা কল্পনার উৎস আজকের মত এমন নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে বোধ হয়নি।

অথচ সেই রমাই আজ—

অকস্মাৎ দোর ঠেলে বেশ একটু উত্তেজিতভাবে গৃহিণী প্রবেশ করলেন। সেদিনের সে রূপ বা লাবণ্যের স্মৃতিটুকু দেহ থেকে একেবারে যায়নি বটে, কিন্তু এই মেদময়ীর মধ্যে রমাকে খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন বৈকি ! বয়স বেশী না হলেও মেদ-বাহুল্য তাঁকে এনে দিয়েছে অকালবার্দ্ধক্য—চামড়া ইতিমধ্যেই যেন হয়ে এসেছে লোল, বাতের জন্য ডান পা-টা খুঁড়িয়ে চলতে

হয়! শীতকালের রাত্রে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় বলে শুতে পারেন না মোটেই, বসে বসে ঘুমোন। একদিন তিনি নগদ মূল্যের লোভে সাহিত্য থেকে জোর করে রোমান্স বাদ দিয়েছিলেন, সেই জন্যই কি বিধাতা জীবন থেকেও তা এমনি করে মুছে নিশ্চিহ্ন করে নিলেন?

গৃহিণী বললেন, 'কেমন বলিনি যে ঐ নতুন চাকরটা আস্ত চোর? তুমি ত একেবারে বিপিন বলতে অজ্ঞান! তুমি ওকে খুঁজে এনেছ কিনা, তাই চুরি করলেও কিছু বলবার যো নেই—যা করুক না কেন ও বাপের ঠাকুর।'

হতভম্ব শিবদাসবাবু কলমটা বন্ধ করে রেখে প্রশ্ন করলেন, 'বলি হল কি? ব্যাপারখানা কি খুলে বলো—'

'ব্যাপার আবার কি! ভাঁড়ার ঘর আর ওদের ঘরের মধ্যে পার্টিসানটা ছাদ অবধি ক'রে দাও কতদিন ধরে বলছি, তা তোমার ত চৈতন্য হয় না। আমার ক'দিন ধরেই সন্দেহ হচ্ছে যে চালডাল সব যেন তাড়াতাড়ি কমছে—আজ একেবারে হাতেনাতে ধরেছি!'

মনটা গল্প থেকে এতক্ষণে সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে। শিবদাসবাবু উত্তেজিত-ভাবে সোজা হয়ে বসলেন, 'কী রকম?'

'মাথা ধরেছে বলে সকাল ক'রে শুয়ে পড়েছিলুম, ব্যাটা ভেবেছে মা আর নীচে নামবে না। তাই বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই পার্টিসান ডিঙিয়ে নেমেছিল ভাঁড়ারে কিন্তু বুদ্ধির এমন দোষ, নিজের ঘরের দোরটায় আর খিল দেয়নি। হাজার হোক ভগবান আছেন ত! ব্যস্—নবীনকে ভাঁড়ারের চাবি খুলতে বলে আমি ওর দোর খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালুম—আর যাবে কোথায়! বমাল-সুদ্ধ ধরা পড়ে গেল।'

'তারপর? কি করলে?'

'পুলিশে দেব বলেই ঠিক করেছিলুম, বড্ড কান্নাকাটি করতে লাগল। উঠোনে নাকখৎ দেওয়ালুম, জুতো মাথায় করে কান ধরে উঠবোস করলে—

তারপর ছেড়ে দিয়েছি। মরুক গে—কী আর হবে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে।'

'তবু ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আবার কার সর্ব্বনাশ করবে তার ঠিক কি!'

'তা অবশ্য বটে।' ওপাশের সোফাটায় বসে পড়ে বাতের পা-টায় হাত বুলোতে বুলোতে গৃহিণী বললেন, 'তবে শিক্ষাও ওর হয়েছে খুব। লজ্জা থাকে ত আর এ-কাজ করবে না।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, দ্যাখো আর একটা কথা—তোমার ত আজকাল দেখা পাওয়াই যায় না। আমার যখনই সময় হয় তখনই দেখি তুমি ব্যস্ত।......আমি একবার হরি স্যাকরাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

শিবদাসবাবুর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। একটু বিপন্ন কণ্ঠেই বললেন, 'কেন গো?'

'আমার সেই বারোমেসে হারছড়াটা কোঁড়া কেটে পড়ে আছে এতকাল, ভাবছি সেইটে ভেঙে আর তার সঙ্গে কিছু সোনা দিয়ে একছড়া কানপাশা নেকলেস গড়াবো। দিদি, দিদির মেয়ে লতু সবাই ওরা গড়িয়েছে, বেশ নতুন ডিজাইন, আর এমন কিছু বেশীও পড়বে না। তাছাড়া হরি স্যাকরাকে আরও একটু দরকার আছে—আমাদের লীলুর চুড়িগুলো ক্ষয়ে একেবারে নরুণের মত পাতলা হয়ে গেছে, ওরও আটগাছা চুড়ি গড়াতে দেবো। হ'লও ত ওগুলো কম দিন নয়—'

ভয়ে ভয়ে শিবদাসবাবু বললেন, 'কিন্তু সোনার দর কি জানো? গিনি সোনা নব্বুই টাকা ভরি।'

ঝঙ্কার দিয়ে গৃহিণী বলে উঠলেন, 'মেয়ের বিয়ে ত দিতে হবে! এখন থেকে একখানা একখানা করে গড়িয়ে না রাখলে চলবে কেন। তখন সব একসঙ্গে

পারবে? তাছাড়া মেয়ে বড় হয়েছে, লোকের সামনে বেরোতে হয়—অন্তত ক'গাছা চুড়িও না থাকলে চলবে কেন?'

তা বটে! অকাট্য যুক্তির সামনে শিবদাসবাবুকে চুপ করে থাকতেই হ'ল। বেতো পায়ে কাপড়ের আঁচলটা টেনে বেঁধে যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে তাঁর স্ত্রী আবারও বললেন, 'ছাখো, আমি বাপু তোমার পকেট থেকে পঞ্চাশটা টাকা নিয়েছি এখন। জানিয়ে রাখলাম, আবার যেন হৈ-হৈ করো না কে নিলে বলে।'

'পঞ্চাশ টাকা? কেন গো—অত টাকা কি হবে?'

'দিদিরা ধরেছে থিয়েটার দেখাতে হবে ওদের—হিসেব করে দেখলুম যে সবসুদ্ধ চৌদ্দজন। তিন টাকার টিকিট কাটতে দিয়েছি এখানেই ত বিয়াল্লিশ টাকা। তাছাড়া ট্যাক্সি ভাড়া আছে। তবু আসবার গাড়ি ভাড়াটা আমি দিদির ওপরেই চাপিয়েছি।'

শিবদাসবাবু চুপ করেই রইলেন। তিনি মনে মনে তখন হিসেব করে দেখছিলেন যে, গত তিন দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে রমার আর কথাবার্ত্তা হয়নি। বলতে গেলে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে, এইটুকুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্ভাষণ।

হঠাৎ কানে গেল পত্নী বলে চলেছেন, 'খোকা বলছে পূজোর সময় দিল্লী-আগ্রা বেড়াতে যাবে, ওর একটা স্যুট চাই—আমি অবিশ্যি কথা দিইনি, বলেছি তোমাকে জিগ্যেস করে বলব—'

'অত খরচ প্রশ্রয় দিও না, বুঝলে? আমার শরীর আজকাল মোটেই ভাল থাকছে না—কবে চোখ বুজব তখন চোখে অন্ধকার দেখবে সব। আর চোখ না বুজলেও যদি এক বছর, দুবছর পড়েই থাকি, তখন দেখবে কে? যতক্ষণে লিখব ততক্ষণে ত? তাছাড়া বাঙালীর ছেলে বেড়াতে গেলেই সাহেবী পোষাক পরতে হবে তার মানে কি? আমি পরি খদ্দর, ছেলে পরবে সাহেবী পোষাক, বাঃ! লোকে বলবে কি?'

'অবিশ্যি'—গৃহিণীর কণ্ঠস্বর কেমন যেন অপরাধীর মত শোনায়, 'অবিশ্যি সে বলেই দিয়েছিল যে, আজকাল এক রকম খদ্দরের ছিট পাওয়া যায়, করলে তারই স্যুট করাবে কিংবা তসরের—তা তাকে বারণ করে দিলেই হবে। তুমি যখন পছন্দ করো না, সত্যিই ত—কাপড়জামা ত কত গণ্ডাই রয়েছে। কী সব সখ তাও বুঝি না। না বললেই আবার ছেলেমেয়েদের মুখ ভার হয়ে যায়, হয়ত বাবু দুদিন বাড়িতে খাবেনই না!'

খানিকটা চুপ করে থেকে বোধ হয় এ পক্ষ থেকে কিছু উত্তরের অপেক্ষাই করলেন, তারপর প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে বললেন, 'না, ঘুম পেয়েছে উঠি এখন—তুমি লেখো। আজ যে বড় এত রাত পর্যন্ত লিখছ? খুব জরুরী তাগাদা আছে বুঝি?

শিবদাসবাবু সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'হুঁ।'

গৃহিণী বেরিয়ে গেলে তিনি আবার লেখা কাগজগুলো তুলে নিলেন। কী লিখেছেন ছাই ভস্ম—এখন পড়তে গিয়ে যেন কিছুই মাথায় যায় না। আসলে তিনি ভাবছিলেন রমার কথাই, শরীর খারাপ যাচ্ছে আজকাল, কবে কী হয় কিছুই বলা যায় না—এমন কথা শুনেও তার তরফ থেকে আজ কোন উদ্বেগের চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজে পেলেন না! অর্থাৎ কথাটা তার কান পর্যন্ত পৌঁছেই ফিরে এসেছে, প্রাণে পৌঁছয়নি। স্বামীর সম্বন্ধে একটুকু চিন্তারও অবসর নেই তার আজকাল! অথচ—

থাক্ গে, অথচ কী ছিল একদিন তা ভেবে আর দরকার নেই। সে আবেগ-বিহ্বল প্রথম যৌবন তাঁরা অনেকদিন পেছনে ফেলে এসেছেন। সে বয়স আর কারুরই নেই, তাঁরও না, রমারও না। এখন তিনি ব্যস্ত তাঁর কাজ নিয়ে আর তার স্ত্রী ব্যস্ত তাঁর ছেলেপুলে সংসার নিয়ে। এখন ওসব উদ্বেগ আশা করাই ভুল।

চতুর্দোলা

শিবদাসবাবু জোর করে কলম খুলে লিখতে বসলেন। এতটা যখন লিখেছেন—তখন আর একটু চেষ্টা করে এটা আজ শেষ করেই ফেলবেন। অনেকদিন পরে এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটলে একটা আত্মতৃপ্তিরও কারণ থাকবে, বুঝতে পারবেন তিনি যে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাযনি তাঁর সৃজনী-শক্তি।

কথাটা ভাবলেন কিংবা নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে নতুন করে উৎসাহ আনবার চেষ্টা করলেন—সে সম্বন্ধে যেটুকু সংশয় মনে জাগতে পারত তাকে দমন করে খস খস করে লিখে চললেন কয়েক লাইন। লিখছেন কলকাতা শহরের এক দরিদ্র কেরাণী-দম্পতির গল্প। ছোট একটা ঘর ভাড়া করে থাকে তারা, সামান্য আয়ে সংসার চালাতে হয়, তার ওপর চার-পাচটি ছেলেমেয়ে—তাদের রোগ, নানা অশান্তি তবু ওদের অন্তরের সেই অনির্ব্বাণ শিখাটি আজও কেমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, প্রীতি ও নির্ভরতা এবং দুঃখের সংসারেও কেমন শান্তির কারণ হয়ে আছে—এইটিই হল তাঁর গল্পের প্রতিপাদ্য। লোকটি প্রথম যৌবনে এই মেয়েটির প্রেমে পড়ে। মেয়েটি ছিল গরীব—তার ওপর কোন পক্ষেরই মা-বাবার মত ছিল না এ বিয়েতে। তবু সেদিন সে যে ঐ মেয়েটিকেই বিয়ে করে স্বেচ্ছায় পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ ছেড়ে এসে এই দারিদ্র্য ও অভাবকে বরণ করে নিয়ে ভুল করেনি, পার্থিব সমস্ত দৈন্য যে দূর করতে পেরেছে তাদের অন্তরের সম্পদ—এইটিই জোর করে দেখাতে চান শিবদাসবাবু। এটা তাঁর বহুদিনের বিশ্বাস, আজ সেই বিশ্বাসকে যেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চান। হয়ত কথাটা পুরোনো, তবু লিপি-কৌশলে ও ঘটনা-বিন্যাসে গল্পটি সাহিত্য-পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ হবে সে ভরসা তাঁর আছে। বলার ভঙ্গীতে অনেক পুরোনো কথাই ত নতুন হয়!

কিন্তু—

লিখতে লিখতে কেমন যেন একটা দুর্ব্বলতা বোধ করেন শিবদাসবাবু—

বিশ্বাসের অভাব, নিজের প্রতিপাদ্য সত্যে আস্থার অভাব। যা লিখছেন এর মধ্যে কিছু সত্য কি আছে? জীবনে কি সত্যিই এমন হয়? যাকে তাঁরা অনির্ব্বাণ শিখা বলে এসেছেন, তার কোন অস্তিত্ব কি সত্যসত্যই আছে? না কি তাঁরা—অর্থাৎ কবি ও সাহিত্যিকরা এতকাল ঠকিয়েই এসেছেন লোককে? লোকে যা চায়, যা ঘটলে তারা খুশী হ'ত—সেই অবাস্তব কল্পনাকে সত্য বলে চালিয়ে এতদিন ধরে পসার জমিয়ে রেখেছেন।

কলম রেখে শিবদাসবাবু জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। যেটা জোর করে বলতে চান সেটার পেছনে তাঁর বিশ্বাসের জোর নেই। কোথায় যেন সব গোলমাল হয়ে গেছে। সত্য বলে মেনে নিতে পারলে তিনি খুশী হতেন—সব মানুষই বোধ হয় খুশী হয়—কিন্তু মনে মনে পিছনে ফেলে আসা জীবনটার ওপর যতদূর দৃষ্টি চলে চোখ বুলিয়ে এর কোন সমর্থনই কোথাও খুঁজে পেলেন না। যতগুলি ভালবাসার ইতিহাস তাঁর জানা আছে কেউই অনির্ব্বাণ শিখা নয়—এমন কি দীর্ঘস্থায়ীও নয় তাদের অস্তিত্ব। মানুষ ভালবাসে একমাত্র নিজেকেই, অপরের চিত্ত জয় করার মধ্যে একটা যে অপরিসীম আত্মতৃপ্তি আছে তারই নেশায় সে ছোটে।……

বাইরে শহরের সঙ্কীর্ণ গলির ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যায়, তারই দিকে চেয়ে চেয়ে শিবদাসবাবু নিজের জীবনের কথা ভাবতে লাগলেন। হ্যাঁ, ভালবাসা তাঁর জীবনেও এসেছিল বৈকি! একবার নয় বহুবার—আর সে বাল্যকাল থেকেই। তিনি জাতশিল্পী, কল্পনা ও ভাবপ্রবণ মন তাঁর—রোমান্সকে অবলম্বন না করে থাকতে পারতেন না। মনে আছে যখন মাত্র তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স, তখনই তাঁর খেলার সাথী একটি সমবয়সী মেয়েকে তিনি ভালবেসেছিলেন। অন্তত তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল সেদিন—সেই মেয়েটি, রেণু তার নাম—সে জানলায় তাঁরই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একথাটা ভাবতে সেদিন খুবই ভাল লাগত। তারপর তার যখন বিয়ে হয়ে গেল—কী কান্নাটাই

না কেঁদেছিলেন তিনি। তখন তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন, তবু মনে হয়েছিল বুক সেদিন ভেঙে যাবে ঐ মেয়েটির অভাবে। কেঁদেছিল রেণুও—বিয়ের আগের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল তা-ও মনে আছে। তারপর কোথায় কি! পরবর্ত্তী জীবনে দেখা হলে তাঁরা পরস্পরকে এ নিয়ে কত ঠাট্টা করেছেন।

তারপর প্রথম যৌবনে এল প্রচণ্ডতর ধাক্কা: তখন তাঁরা মধুপুরে গেছেন বেড়াতে। এম-এ পরীক্ষা দেবার পর দীর্ঘ অবকাশ—কোন কাজ নেই, মায়েরও শরীর খারাপ; সুতরাং স্থির হয়েছিল চার পাঁচ মাস থাকবেন তাঁরা ওখানেই। সেখানে পাশের বাড়ির লতিকা আসত তাঁর কবিতা ও গল্প শুনতে। বলতে গেলে সে-ই তাঁর প্রথম পাঠিকা—তখনও পর্য্যন্ত কোন বড় কাগজে তিনি ভরসা করে লেখা পাঠাতে পারেন নি। সুশ্রী কিশোরীর মুগ্ধ দৃষ্টি সেদিন তাঁকে পাগল করে দিয়েছিল, মনে হয়েছিল একে জীবনসঙ্গিনী না করতে পারলে জীবনের কোন অর্থ নেই।

সেদিন অনেক উঞ্ছবৃত্তিই ধরেছিলেন তিনি—আজও মনে হলে লজ্জা করে। পূর্ণবয়স্ক যুবক তিনি—সারাদিন বসে বসে ভাবতেন কেমন করে লতুর ঐ আঙুলের ডগাগুলি স্পর্শ করবেন। কী ক'রে তার মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটবে, এই চিন্তাতে সেদিন সারা রাত্রি বিনিদ্র কাটত। কত ছল, কত ফন্দী—এমন কি, বলা যায় কত তপস্যাও—করেছিলেন তিনি দিনের পর দিন, শুধু বার বার তার দেখা পাবার জন্য। সে সময়ে জীবনের আর কোন সার্থকতাই ছিল না। চোখের সামনে লতুকে পাওয়া ছাড়া। যশ, অর্থ, সম্মান, সাহিত্য-সৃষ্টি সবই অর্থহীন বলে মনে হত। সেদিনকার সে আবেগ, সে বেদনার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল একথা স্বয়ং ভগবান বললেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করে ছিল ঐ এক অনুভূতি, সমস্ত মনে ছিল ঐ এক চিন্তা।

তবু তিনি পাননি লতিকাকে। তারা ব্রাহ্ম, তাতে হয়ত শিবদাসবাবুর

আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাদের ছিল। বিশেষত তিনি তখন বেকার, দেশের জমি-জায়গার মাঝারী আয়, এই ছিল তাঁদের একমাত্র ভরসা। ব্যবসা বা চাকরী না করে সাহিত্য-চর্চ্চা করবেন তখন স্থির করে ফেলেছিলেন বলে আর কোন চেষ্টাও করেন নি। সে আশা ছেড়ে হয়ত লতিকার জন্য তিনি সরকারী অফিসে উমেদার হয়েও দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য লতুর বাবা অপেক্ষা করতে রাজী হননি, বরং ব্যাপারটা জটিলতর হ'তে পারে এই আশঙ্কা করে তাড়াতাড়ি মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে এক সদ্য-চাকরী পাওয়া সাব-ডেপুটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

সেদিনের কথা মনে হলে আজ হাসি পায় বটে। কিন্তু তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে সে বেদনাটা সেদিন বেজেছিল মর্ম্মান্তিক। অত বয়সেও তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে বাধে নি। প্রতি রাত্রে চোখের জলে তাঁর গোটা পরিধেয় কাপড়খানা ভিজে উঠেছে—বহুদিন ধরে। আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিলেন বার-দুই, রুগ্ন মায়ের প্রতি কর্ত্তব্যবোধে নিরস্ত হয়ে ছিলেন। আরও কত কী নাটকীয় চিন্তা প্রতিদিন মাথায় আসত—কত রকমে প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করতেন সর্ব্বদা। লতিকা যাতে চিরদিন তাঁরই জন্যে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জল ফেলে—এর জন্য পরিকল্পনার সেদিন অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ ?

সেদিন যে লতিকা তাঁর ঘাড়ে চাপেনি, এজন্য আজ তিনি কৃতজ্ঞ। মনে হয় কী বেঁচেই গিয়েছেন তিনি। আজ এই দীর্ঘ-জীবনের অভিজ্ঞতায় এটা বুঝতে পেরছেন যে, আর যাই হোক লতিকাকে নিয়ে তিনি সুখী হতে পারতেন না। তার স্বভাবের বহু দোষ, যা সেদিন চোখে পড়েনি, আজ মনে মনে মিলিয়ে শিউরে ওঠেন—বার বার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান সেদিন লতুর বাবা রাজী হননি বলে।

তারপর এল রমা। খুব দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মেয়ে সে, তিনি যখন

দেখেন, তখন তার মাত্র ষোল বৎসর বয়স। দেখাত আরও কম। তবু তার রূপ, বালিকাসুলভ লাবণ্য ও সৌকুমার্য্য সেদিন তাঁকে মুগ্ধ ও দিশাহারা করেছিল, আর সব কথা ভুলে গিয়ে নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই বারই তাঁর সত্যকারের সার্থকতাকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন। ঐ মুকুলিকা কিশোরীর অন্তরের মাধুর্য্য-শতদলকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে পারাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হবে।

আর বাস্তবিক রমাকে বিয়ে করার পর কয়েকটা বছর কেটেছে যেন দীর্ঘ এক সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তাকে নিয়ে তিনি সেদিন সুখীই হয়েছিলেন। প্রেম বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা তিনি আজও জানেন না, কিন্তু একজনের জন্য অপরের আকর্ষণ, আকুলতা ও আবেগ—এই যদি তার মোটামুটি অর্থ হয়, তাহ'লে তা তাঁদের ছিল। কবির ভাষায় তাঁর 'জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী' সেদিন তিনি সত্যই পান করতে পেরেছিলেন। জীবন সেদিন তাঁর ধন্য, সার্থক হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তা কোথায় গেল? সে প্রেমের কিছু অবশিষ্ট আছে কি?

তিনি আছেন, রমাও আছে। অথচ সে আকুলতার ত কিছুই অবশিষ্ট নেই। অবশ্য প্রথমকার উচ্ছ্বাস পরিণত জীবনে আশা করা মূর্খতা—তা তিনি করেনও না। আজ যদি তিনি আশা করেন যে, তাঁর ফেরবার সময়ের বহু আগে থেকে গৃহিণী রমা কিশোরী রমার মত বাতায়ন-পথে অপেক্ষা করবে কিংবা আগেকার মত তাঁর লেখার সময়ে আরক্ত চোখে শুধু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকবে, তাহলে নিজের কাছেই তিনি হাস্যাস্পদ হয়ে পড়বেন।

তা তিনি করেনও না। কিন্তু তবু সে অনির্ব্বাণ শিখার কোন আলো কি থাকা সম্ভব নয়? পরস্পরের যে গভীর ঐক্য ও সহানুভূতি থাকা উচিত, তাই-বা কোথায় আজ? গৃহিণী তাঁর ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী প্রভৃতি

নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে স্বামীর খোঁজ নেবার সময়ও পান না। বছরে কদিন দেখা হয় তাঁদের সে কথাটা হিসাব করে দেখবার মত। তিনিও আছেন তাঁর লেখা আর বাইরের জগৎ নিয়ে। তাঁর দুধ, তাঁর চা, তাঁর খাবার আসে চাকরের মারফৎ। রমার টাকার দরকার হলে ছেলেমেয়েকে দিয়ে চেয়ে পাঠায় কিংবা পকেট থেকে বার করে নেয়। ওঁর কাজ সম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার—কী লেখা লিখছেন তিনি আজকাল, তা-ও সে জানে না। বর্ত্তমান কালের বইগুলোও সে পড়েনি। তিনিও তার খবর রাখেন না, অসুখ করলে ছেলেরা যায় ডাক্তার ডাকতে—খুব বেশী কিছু হয়েছে খবর পেলে অবশ্য তিনি খবর নিতে যান। কিন্তু সে উদ্বেগের সামান্য অংশও আছে কি? বরং লেখার সময় বা বিশেষ প্রয়োজনে যখন বাইরে যাচ্ছেন, এমন সময়ে এসব খবর পেলে একটু বিরক্ত হন। আর রমাও—অসুখ করেছে বলে ডেকে না পাঠালে সে নিজে থেকে কোনদিন খবর নেয় না। এমন কি, চাকরকে দিয়ে 'শরীর খারাপ হয়েছে, খাবো না' বলে পাঠালে চাকরকে কিংবা কোন ছেলেমেয়েকে দিয়েই প্রশ্ন করে পাঠায় কী খাবেন তিনি। সাগু কি বালি খাবার নির্দ্দেশ শুনলে তবে নিজে খবর নিতে আসে কী হয়েছে!

এই ত আজও—কিছু আগে তিনি নিজেই বললেন যেচে সেধে—ভিক্ষুকের মত যে, তাঁর শরীর খারাপ, এমন কি যে-কোন সময়েই মারা যেতে পারেন কিন্তু কথাটা সে ভালো করে শুনলে না পর্য্যন্ত। সে সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা ত দূরের কথা, একটা উল্লেখ পর্য্যন্ত করলে না পরের কথায়। তিনি আর তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র, রমা আর তার কর্ম্মক্ষেত্র থেকে এতই দূরে চলে গিয়েছে যে, দুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্রই আজ আর খুজে পাওয়া সম্ভব নয়! তবু ত তাঁর অভাবের সংসার নয়—প্রতিদিনের অন্ন-সংস্থানের জন্য কিংবা ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার জন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই। অপ্রীতি ও অসন্তোষ যে কারণে জমে, মনের মধ্যকার আনন্দরসধারা যে কারণে শুকিয়ে যায়,

সেরকম কোন কারণই নেই তাঁদের জীবনে। তিনি পেয়েছেন যশ ও সার্থকতা, তাঁর স্ত্রী পেয়েছে প্রাচুর্য্য ও সম্পদ—বিলাসের, স্বাচ্ছন্দ্যের অজস্র উপকরণ। সেখানেই যখন এতটা দূরত্ব, এতটা ব্যবধান রচিত হতে পেরেছে, তখন কি তিনি আশা করেন যে গরীব কেরাণীর সংসারে, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত্ত বেঁচে থাকার জন্য ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণে লড়াই করতে হয় –অভাব, অনটন ও অসন্তোষ যেখানে পুঞ্জীভূত, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মন এবং মস্তিষ্ক যেখানে অসংখ্য দুশ্চিন্তায় পীড়িত ও ক্লিষ্ট—সেখানে প্রথম যৌবনের ভালবাসার কোন চিহ্ন থাকবে ?......

অত্যন্ত গ্লানি ও অপ্রীতিকর চিন্তায় শিবদাসবাবু যেন শিউরে উঠলেন। তাড়াতাড়ি জানলার ধার থেকে ফিরে এসে আবার বসলেন তাঁর গদি-আঁটা চেয়ারে। লেখা পাতাগুলো তুলে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন, যদি তা থেকে মনে কোন বল পান—এই ভরসায় !

হ্যাঁ, পড়তে মিষ্টি লাগে তাতে সন্দেহ নেই। জীবনে যদি এমনটা ঘটত তাহলে সবাই খুশী হ'ত, কিন্তু মন এটা বিশ্বাস করতে চায় না আর। ভেতর থেকে কোন জোর, কোন প্রেরণা যেন আর তিনি পাচ্ছেন না।

তবে কি মানুষের জীবনে এই অন্ধকারময় দিক্‌গুলোই সত্য ? দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অবিচার, অভাব, অনটন, ঈর্ষা, কুটিলতা, ব্যর্থতা ! যা আজ তাঁর এবং তাঁর সমসাময়িক অন্য সাহিত্যিকদের রচনার বেসাতি হয়ে উঠেছে— এইগুলোই শাশ্বত, অনাদি এবং অনন্ত। জীবনে এইগুলোই শুধু চিরস্থায়ী ?

অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন শিবদাসবাবু। তাই বা মানতে পারেন কৈ ? তাঁর সমস্ত অন্তর একথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যা কুশ্রী, যা নিতান্ত গ্লানিকর, মানুষের জীবনে তা-ই সত্য হয়ে থাকবে। যেটুকু আলো, যেটুকু আনন্দ সে পেলে তার কোন মূল্য নেই ? কারুর জীবনেই তা সত্য হয়ে থাকবে না ? আজ এতদিন পরে এই কথাই কি তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে ?

রমা? তাঁর রমা—তাঁকে আর ভালবাসে না? আজ কি তাহলে এইটাই সত্য হয়ে উঠেছে যে তাঁদের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে আর কোন মাধুর্য্যের অস্তিত্ব নেই?

তাঁর বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকটায় একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে এলেন শিবদাসবাবু। শুধু তাঁর মুখ দেখে তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারত রমা—এমন কি কখন তিনি তাকে দেখতে চাইবেন, কখন সুন্দরী কিশোরী স্ত্রীর উপস্থিতি তাঁকে আনন্দ দেবে এটা পর্য্যন্ত বুঝতে পেরে গুরুজনদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে নানা কৌশলে এবং ছুতোয় সে কাছে এসে দাঁড়াত কিংবা সামনে দিয়ে চলে যেত। সংসারের সহস্র কাজের মধ্যে একটা চোখ এবং একটা কান যেন তার পাতা থাকত স্বামীর দিকেই। সেই রমা—তাঁর প্রিয়তমা, তাঁর আদরিণী স্ত্রী—এরই মধ্যে, জীবিত অবস্থাতেই তাঁর জীবন থেকে একেবারে বাইরে চলে গিয়েছে? তাই কি সম্ভব?

অকস্মাৎ এতদিন পরে বহুদিনের ভুলে যাওয়া আবেগ ও আকুলতায় থরথর করে কেঁপে উঠলেন শিবদাসবাবু। এই ত মনে হয়েছিল যে, তিনিও বুঝি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছেন রমার অস্তিত্ব, কিন্তু আজ এতদিন পরেও ত তিনি তেমনি আকুলতা, তেমনি বেদনা অনুভব করছেন তার জন্য। তাহলে বোধ হয় যায় না—কিছুই যায় না নষ্ট হয়ে, অনির্ব্বাণ শিখা ঠিকই জ্বলে, তবে হয়ত কখনও তা জ্বলে লোক-চক্ষুর অন্তরালে!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের স্মৃতি সব যেন ভীড় করে এসে দাঁড়াল তাঁর মাথার মধ্যে। মনে হ'ল যেন তিনি বহুকাল উপবাসী আছেন—তৃষ্ণায় তাঁর বুক পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। একবার রমাকে কাছে পাবার জন্য, তার দুটো মিষ্টি কথার জন্য তাঁর সমস্ত মন একাগ্র হয়ে উঠল, বুকের কাছে যেন তিনি একটা তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করতে লাগলেন।

একবার তিনি যাবেন নাকি রমার কাছে? এই ত পাশের ঘরই—

মধ্যেকার ঐ দোরটা ভেজানোই আছে—কেউ জানতেও পারবে না। দোষ কি? স্বামীর যদি স্ত্রীকে প্রয়োজন হয়—এতে লজ্জার কি কারণ থাকতে পারে?

ইচ্ছার তীব্রতা ও একাগ্রতায় পা যেন টলছে তাঁর, তবু তিনি উঠলেন, কোনমতে পা টেনে টেনে গিয়ে মধ্যেকার দরজাটা খুলে ফেললেন। অনেক-দিন বন্ধ থাকার ফলে মাকড়সার ঝুল ও ধূলোয় তা আচ্ছন্ন হয়ে আছে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না তাঁর। ঘরে নীল আলো জ্বলছিল, তাতেই স্পষ্ট দেখা গেল ঐ ত শুয়ে আছে রমা, এক পাশে তার নাতনী লেখা, আর এক পাশে ছেলে বঙ্কু।

দোর খোলার সময় বোধ হয় একটু বেশীই শব্দ হয়েছিল—গৃহিণী চমকে উঠলেন, 'কে! কে ওখানে?'

'আমি রমা, আমি।' কম্পিতকণ্ঠে কোন মতে বললেন শিবদাসবাবু।

'তুমি? কেন গো? কী হয়েছে? চোর এসেছে নাকি?' ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি।

'না না চোর নয়। তুমি ভয় পেয়ো না। বলছিলুম আজ তুমি আমার কাছে একটু থাকবে? শরীরটা আমার যেন মোটেই ভাল লাগছে না।'

গৃহিণী নেমে একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন—'কী ব্যাপার বলো ত? জ্বর হয়েছে? কৈ দেখি?'

'না—জ্বর নয়।' অপ্রতিভভাবেই বললেন শিবদাসবাবু।

'মাথা ঘুরছে?'

'না না, তাও নয়। এমনিই। থাকো না একটু কাছে!' কেমন যেন ভিক্ষার সুর তাঁর কণ্ঠে।

'তাইত! লেখাটার যে বড় জ্বর! ঘ্যান ঘ্যান করছে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা অন্তরই। ও-ত আর কারুর কাছে থাকবে না—বরং এক কাজ করি মোহিতকে ডেকে দিই, কাছে এসে শুক্—'

মোহিত তাঁদের বড় ছেলে। বিরক্তি ও হতাশায় শিবদাসবাবুর মুখ কালো হয়ে উঠল। তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন, 'না না, তাদের আর বিরক্ত করতে হবে না। আচ্ছা, তুমি শোও—আমি একাই থাকব'খন।'

'তুমি রাগ করছ কিন্তু কী করে যাই বলো দিকি। মেয়েটাকে নিয়ে গেলেও তোমাকে বিরক্ত করবে!' অপরাধীর মতই দীন ভঙ্গি তাঁর, দেখলেও মায়া হয়। আবারও বললেন, 'আচ্ছা—এই দোরটাই খোলা থাক না, আমার ত নাতনীর জন্যে আর রোগের জ্বালায় ভাল করে ঘুমই হয় না, একটু ডাকলেই ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কিছু কষ্ট হলে কিংবা কিছু দরকার হলেই ডেকো—কেমন?'

'তাই হবে—তুমি শোও!' শিবদাসবাবু নিজের ঘরের দিকে ফেরেন।

'তুমি রাগ করলে, হ্যাঁ গো?'

'না না, তুমি শোও।'

ফিরে আসবার সময় দোরটা ভেজিয়েই দিলেন তিনি। ও পক্ষ থেকেও সে সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ এলো না।

আরও অনেকক্ষণ জানলার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর শিবদাসবাবু ফিরে এসে তাঁর রাইটিং ডেস্কের সামনে বসলেন। এতক্ষণের পরিশ্রমের ফল ক্ষুদি-ক্ষুদি লেখা এই সাতটা পৃষ্ঠা কাগজ তাঁকে যেন বিদ্রূপ করছে, অন্তত সেদিকে চেয়ে তাই মনে হল। সে পরিহাস সহ্য করতে না পেরে তিনি কাগজগুলো গোছা করে হাতে তুলে নিলেন। এখনই ছিঁড়ে ফেলা যাক। এতক্ষণ বৃথাই সময় নষ্ট করেছেন তিনি—যে উপন্যাসখানা লিখছেন 'আসন্ন বিপ্লবের ভূমিকা' বলে, তারই দুটো পরিচ্ছেদ এই সময়ে লেখা হতে পারত।

কিন্তু ছিঁড়তে গিয়েও চোখ তাঁর অজ্ঞাতেই শব্দগুলার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে

যায়। না, রচনা তাঁর ভালই হয়েছে—হয়ত অবাস্তব, অসম্ভব—তবু পড়তে ভাল লাগে। এমন কি বিশ্বাসও হয়।

থাক্ না—এমনটা যদি বাস্তব জীবনে সত্য না-ই হয়—না হয় সাহিত্যেই সত্য হয়ে থাক। মানুষের মন জীবনের মধ্যে যদি কোথাও কোন সান্ত্বনা বা আশ্বাস খুঁজে না পায—রইল তবে তার জন্য তা সাহিত্যের মধ্যেই। চারি-দিকের এই নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার মধ্যে এইটুকুই থাক উজ্জ্বল ও শাশ্বত হয়ে। প্রেম হয়ত বিশ্বে মৃত্যুহীন নয়—তাতে ক্ষতি কী? সাহিত্যেই তা অমর হয়ে থাকুক।

কাগজগুলো সযত্নে ডেস্কের মধ্যে তুলে রেখে শিবদাসবাবু উঠে পড়লেন। আলোটা নিভিয়ে দিতে হবে এখন—অনেক রাত হয়েছে।

মুসাফির

সমস্ত ট্রেণটার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় বার দুই ঘুরিয়া আসিলাম, কোথাও এতটুকু স্থান মিলিল না। ভিতরে জায়গা আছে, কি না তাহা বুঝিবারও উপায় নাই, দরজার কাছে যাহারা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের অনুগ্রহে। যুদ্ধের সময় বলিয়াই বোধ হয়, অসামরিক ভদ্রলোকদেরও মেজাজ যেন মিলিটারী হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কাছে ঘেঁষে কাহার সাধ্য!

তবু উঠিতে হইল। ঘণ্টা ও গার্ডের হুইশিলে ট্রেণ যখন ছাড়িয়া দিয়াছে তখন একরকম মরিয়া হইয়াই একটা বড় দরবারী কামরার (তখন দেখিবারও অবসর ছিল না—সামনে যে গাড়ী পাইলাম তাহাতেই) জানালা দিয়া হাতের ছোট সুটকেসটা গলাইয়া ফেলিয়া দিয়া দ্বাররক্ষীদের নিশ্চিন্ত অসতর্কতার

অবসরে পা দুইটা ভিতরে ঢুকাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, দরজার সামনে যাহারা ছিলেন তাঁহারা মুহূর্ত্তে সজাগ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন আর উপায় কি? চলন্ত ট্রেণ হইতে সে অবস্থায় আমাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ স্থির-মস্তিষ্কেই আমাকে হত্যা করা। তবু তাঁহারা খানিকটা অসহযোগ করিতে ছাড়িলেন না—আমি তেমনি হাতল ধরিয়া দেহের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশটা বাহিরে রাখিযা ঝুলিতে লাগিলাম, তাঁহারাও তেমনি স্থানুবৎ অচল হইয়া পথ রুখিয়া দাঁড়াইযা রহিলেন। ভাবটা এই যে, যেমন চালাকী করিযা ভিতরে ঢুকিতে গিয়াছিলে তেমনি মরো এখন—মোদ্দা আমরা এক ইঞ্চিও নড়িব না। আমরা যে আগেই বলিয়াছিলাম ভিতরে স্থান নাই, সে কথাটা মিথ্যা প্রমাণ করিতে দিব না।

আমিও চট করিয়া তাঁহাদের ঘাঁটাইলাম না। মোগলসরাই-এর বিরাট ইয়ার্ড তখনও শেষ হয় নাই। গাড়ী মন্থর গতিতে লাইনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঝাঁকানি খাইতে খাইতে পার হইতেছে, সুতরাং মাথাটা লইয়াই বিপদ—অসংখ্য সিগনাল পোষ্টের কোন্‌টাতে কখন যে লাগিয়া যায় ঠিক নাই। তবু ঝুলিয়াই রহিলাম আরও মিনিট দশেক। তারপর আর একবার, কর্ত্তাদের অন্যমনস্কতার অবসরে শিথিল মাংসপেশীর সুযোগ লইয়া আর একটা প্রকাণ্ড ধাক্কায় ভিতরে চলিয়া গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আন্তর্জ্জাতিক গালাগালির যেন ঝড় বহিয়া গেল। অর্থাৎ দরজা আটকাইয়া যাঁহারা খাড়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী ছাত্র শ্রেণীর যুবক, কাবুলিওয়ালা, সিন্ধি মুসলমান, বিহারী এবং শিখ—সব জাতিরই প্রতিনিধি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কাহাকে নাকি এই ভিতর প্রবেশের অজুহাতে লাথি মারিয়াছি, কাহাকে ধাক্কা লাগাইয়াছি, আমি অভদ্র, অন্ধ, ইতর—এই সব। আমি এই অভিযোগ ও গালাগালির একটিও জবাব দিলাম না, কারণ তখন আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য শুধু ইঁহারা নন

গাড়ীসুদ্ধ সকলেরই বৈরীভাব, আর দ্বারোযানগুলির ত কথাই নাই। একটা মারামারির ভূমিকার জন্য যেন সকলেই তখন প্রস্তুত। এসব ক্ষেত্রে আসল মারামারি কদাচিৎ হয়, সেকথা জানা থাকে বলিয়াই ভিড়ের মধ্যে আস্তিন গুটাইয়া বিক্রম দেখানো সহজ।

আমি বরং অস্ফুটকণ্ঠে একটা ক্ষমা প্রার্থনার চেষ্টা করিয়া একটা পা একজনের বাক্স এবং আর একটা পা অপর একজনের হোল্ডঅলের উপর দিয়া কোনমতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইলাম। বড় গাড়ীর একটা সুবিধা এই যে, ভিড যতই হউক একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাওয়া যায়। তা ছাড়া এ গাড়ীতে স্থান এমনিই ছিল। বেঞ্চিগুলিতে যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা যথেষ্ট জায়গা জুড়িয়াই বসিয়াছেন—আরাম করিয়া বসিতেও ঠিক অতটা জায়গা লাগে না। আসল কথা হয়ত শেষ পর্যান্ত ঠেলিয়া ঠেলিয়া ইহারই ফাঁকে রাত্রে একটু কোমরটা সোজা করা যাইবে, এ আশা তাঁহাদের সকলকারই ছিল। আর সেই উদ্দেশ্যেই, এক এক দলের একজন বা দুইজন দুইটি বেঞ্চির মধ্যেকার প্রবেশপথটুকু জোড়া করিয়া ট্রাঙ্ক বা বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া আছেন। অর্থাৎ এতই স্থানাভাব যে, তাঁহাদের আর বেঞ্চে বসিবারও ঠাঁই মিলে নাই। আর সব চেয়ে ভিড় সামনা-সামনি দুইটি দরজার মাঝের জায়গাটুকুতে। বোধ হয় মাঝপথে আমার মত যত অভাজন উঠিয়াছে, সকলেই এই সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে মালে আর মানুষে ঠাসাঠাসি—তিল ধরিবারও কোথাও উপায় নাই।

আমি ইতিমধ্যেই একবার সবটায় চোখ বুলাইয়া লইয়াছিলাম। অপেক্ষা-কৃত ছোট বেঞ্চিগুলির দিকটায় দুইটি বাঙ্গালী পরিবার স্থান লইয়াছেন। একটির সহিত কি করিয়া এক জোড়া মাদ্রাজী স্ত্রী-পুরুষও ঢুকিয়া গিয়াছেন। আর বড় বেঞ্চিগুলিতে বোধ হয় ভারতবর্ষীয় এমন কোন প্রদেশের লোক নাই যাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। শিখ, মারোয়াড়ী, উড়িয়া, সিন্ধি,

সাঁওতাল—মায় কাবুলীওয়ালা, বেলুচী পর্য্যন্ত। মারোয়াড়ীরা যেখানে বসে মালপত্রে একটা পাঁচিল তুলিয়া মধ্যে অনেকটা স্থান জোড়া করিয়া রাখে; এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। হয়ত ঝগড়াঝাঁটি করিয়া তাহার মধ্যে একটুখানি জোর করিয়া দখল করা যাইত। কিন্তু তাহাদের আনুষঙ্গিক হিসাবে জল, ফলের খোসা, ছেলেমেয়েদের কুকার্য্যের বোঝা এবং পুরী-তরকারীর ছড়াছড়িটা কল্পনানেত্রে দেখিয়া লইয়া সে কাজে আর প্রবৃত্তি হইল না। কোনমতে সুটকেসটা উদ্ধার করিয়া, মানুষ ঠেলিয়া, মাল মাড়াইয়া, বহুলোককে ধাক্কা দিয়া একরকম মরিয়া ভাবেই এক সময়ে বাঙ্গালীদের কাছে আসিয়া পৌছিলাম এবং এক জোড়া বেঞ্চের প্রবেশপথে প্রায় ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় দাঁড়াইয়া সবিনযে বলিলাম, 'বেঞ্চে এখনও ত ঢের জায়গা আছে, আপনারা এক জনও যদি ওখানে চলে যান তাহ'লে আমি একটু এখানে ঠাঁই পাই। যদি একটু দাঁড়াবারও স্থান পেতুম তাহ'লে আর আপনাদের বলতুম না, দেখছেন ত কি রকম তে-শূন্যে আছি!"

সঙ্গে সঙ্গে দুটি বাঙ্গালী তরুণই রুখিয়া উঠিলেন। এক জন কহিলেন, 'ভেতরে ঢের জায়গা আছে! কী বলছেন মশাই, আপনি কি কানা নাকি? দেখছেন, এমনিতেই ওরা কী কষ্ট করে বসে আছেন—মহিলা আর শিশু, ওঁদের ত একটু বেশী জায়গা দিতেই হবে।...জায়গা বেশী থাকলে আমাদের এইভাবে বসে থাকার দরকার কি বলুন?'

আর এক জন কহিলেন 'দাঁড়াবার যে জায়গা নেই তা-ত ওঠবার সময়ই আপনাকে বলা হয়েছিল। জেনে শুনেও উঠলেন কেন?'

অগত্যা চোখে আঙ্গুল দিতে হইল। কণ্ঠস্বর একটু কঠিন করিয়া কহিলাম, 'কানা নয় বলেই ত জায়গা দেখতে পাচ্ছি। আপনারা পথ জোড়া করে আছেন বলে তাই, আর ঠিক অপরিচিতা মহিলাদের পাশে গিযে বসবার ইচ্ছে নেই বলেই—নইলে বসে দেখিয়ে দিতুম যে জায়গা আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যুবকটি মুখ চোখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই। মেয়েদের ঘাড়ের উপর বসবেন আপনি, এত বড় স্পর্দ্ধা ?'

দুই এক জন ইতিমধ্যেই একটা হাতাহাতির গন্ধ পাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। আমিও কণ্ঠস্বর আর এক পর্দ্দা চড়াইলাম—কহিলাম, 'বসবার ইচ্ছে নেই সেই কথাই বলেছি মশাই ; কালা না হ'লে আপনিই সে কথা শুনতে পেতেন। মুখ যদি সামলাতে হয় ত আপনিই সামলান।'

মোড়ের ট্রাঙ্কের দ্বিতীয় তরুণ অধিবাসীটি ত প্রায় দাঁড়াইয়াই উঠিয়াছেন ; কহিলেন, 'খুব যে লম্বা লম্বা কথা বলছেন মশাই—কী করবেন তাই শুনি ? আপনি কি ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন নাকি—না পুলিশ সাহেব, মেজাজ ত খুব দেখছি ?'

জবাব দিলাম, 'মেজাজ যে কার তা এঁরা সবাই দেখেছেন। সে কথা থাক্—লম্বা লম্বা কথা ত বলতে চাইনি। খুবই ছোট কথায় কাজ সারতে চেয়েছিলুম। আর কি করব শুনতে চান ? যদি অনুমতি করেন ত আপনাকে ভেতরে এক জায়গায় বসিয়ে দেখিয়ে দিই যে মহিলাদের বিরক্ত না করেও বসবার স্থান ক'রে নেওয়া যায়। এতগুলো লোক এখানে দাঁড়াতে পর্য্যন্ত পাচ্ছে না ভাল ক'রে, আর আপনারা শোবার জায়গা আগলাচ্ছেন, এটা ত ঠিক কথা নয়।"

একজন বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, 'শোবার কেন, ফুটবল খেলবার বলুন।'

আঙ্গুল দেখাইয়া আরও কঠিনভাবে বলিতে হইল, 'শিশু ত আপনাদের মধ্যে একটি, সে শুয়েই আছে। মহিলাদের মধ্যে একজন বেশ খানিকটা পা ছড়িয়েই বসেছেন, আর দুজনও ওধারের বেঞ্চে পা তুলে আরাম ক'রে বসে আছেন। ওঁদেরও আমি জায়গা ছাড়তে বলছি না, শুধু বলছি—ঐ যে দুটি মহিলার মধ্যে খানিকটা জায়গায় একটা তোয়ালে আর একখানা বই

পড়ে আছে, ওটাও কি তুলে নেওয়া যায় না? ওখানে ত আপনাদের একজন অনায়াসে বসতে পারেন।'

পিছনের দিক হইতে আর একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, 'মহিলাদের দিকে অমন ক'রে আঙ্গুল না দেখিয়ে কি বলা চল্‌ত না?'

বললাম, 'তা হয় ত চলত—কিন্তু এঁদের যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে না দেখালে এঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কী করি বলুন?'

এবারে মহিলাদেরই লজ্জা হইল। এ পাশের দুটি তরুণী মহিলা অনেকখানি করিয়া সরিয়া গিয়া একজন নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, 'এই ছোড়দা, এখানে এসে বসো না—সত্যিই ত জায়গা থাকতে মিছিমিছি ভদ্রলোককে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?'

তবে ছোড়দা ছাড়িবার পাত্র নন। কহিলেন, 'তোদের অসুবিধা হবে না?'

'না, না। বলছি যখন হবে না, তখন অত মাথা ব্যথা কেন তোমাদের?'

অগত্যা প্রথমোক্ত তরুণটি উঠিয়া গেলেন আমি তাঁহাদের ট্রাঙ্কের উপরই জাঁকিয়া বসিলাম। ফলে যুদ্ধটা ভাল করিয়া বাধিবার আগেই যেন বন্ধ হইয়া গেল। ওপাশে যাঁহারা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা আবার মাথা গুটাইয়া লইয়া নিজেদের সুখ-দুঃখের আলোচনায় ফিরিয়া গেলেন। মধ্যপথে যাঁহারা এখনও কষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহারা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বার্থপর বাঙ্গালীর (অর্থাৎ আমি) দিকে একবার ঈর্ষাতুর নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র।

গাড়ী হু হু করিয়া ছুটিয়াছে। চারি দিক হইতে কথা কহিবার একটা গুঞ্জন শোনা গেলেও আমার পাশে গভীর শান্তি। দুই-একবার মহিলাদের

মধ্যে নিম্নকণ্ঠে যে কথা হইয়াছে তাহাতেই ইঁহাদের পরিচয়ের মোটামুটি আভাস পাইয়াছি। দুটি তরুণীই বিবাহিতা—একটি ভাজ, অপরটি ননদ। ননদের অত্যন্ত শরীরর খারাপ হওযাতে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল—তারপর সেখান হইতে এটোয়াতে চেঞ্জে। এটোযাতে বড় ভাই ও ভাজ থাকেন, এখন ভাজ ননদকে কলিকাতায় পৌছাইয়া দিতে চলিয়াছেন, সঙ্গে ঐ ছেলেটি—দেবর, উদ্দেশ্য শ্বশুর বাড়ী একবার ঘুরিয়া যাওয়া। আমার পাশে যে যুবকটি বসিয়া আছেন, বৃদ্ধা মহিলাটি তাঁহার মা, তরুণীটি বোধহয় স্ত্রী। তীর্থ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইয়া আগ্রা পৌছিয়াছিলেন, সেখান হইতেই ফিরিতেছেন। দিল্লী যাওয়া হইল না বলিযা তরুণীটির এবং কুরুক্ষেত্রে স্নান করা হইল না বলিয়া বৃদ্ধার ক্ষোভের সীমা নাই। খুব সম্ভব সহযাত্রী তরুণটির অফিসের ছুটি ফুরাইযাছে বলিয়াই চলিয়া আসিতে হইল—সেইজন্য সে-ই নীরব।

চুপ করিয়াই বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি, সহসা ওপাশ হইতে একটি বিহারী সহযাত্রী বলিয়া উঠিল, 'বাবুজী, ম্যাচিস হ্যায় ?'

চমক ভাঙ্গিয়া দেখি প্রশ্নটা আমাকেই করা হইতেছে। তাড়াতাড়ি দিয়াশলাইটা বাহির করিয়া দিলাম। ধূমপানের মজাই এই যে, একজনকে করিতে দেখিলেই অপরের সে ইচ্ছা প্রবল হয। সুতরাং এইবার নিজেও সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিলাম। প্যাকেটের মুখটা খুলিয়া একটা সিগারেট একটুখানি বাহির করিয়া পাশের তরুণটির সামনে ধরলাম, 'চলবে ?'

বোধ হয় মুহূর্ত্ত তিন চার ভদ্রলোক ইতস্তত: করিলেন, তারপরই মধুর হাস্যে মুখ রঞ্জিত করিয়া একটা টানিয়া লইলেন। বেঞ্চের ভিতরের তরুণটিকেও অনুরোধ করিলাম। তিনি সবিনয়ে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, 'থ্যাঙ্কস, আমি খাই না।'

আমাদের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। আমি দিয়াশলাই জ্বালাইয়া আমার সহযাত্রীটির মুখে ধরিলাম। তিনি সিগারেটটা ধরাইয়া লইয়া কহিলেন, 'এ সিগারেট কি এখান থেকে কিনলেন?'

জবাব দিলাম, 'না, এ আমার কলকাতাতে কেনা।'

যেন তাঁহারই একটা কিছু জয়লাভ হইল—সগর্ব্বে কহিলেন, 'তাই বলুন, টাট্‌কা মাল এখানে পাওয়াই যায় না। যা কিনি—সবই যেন পান্তাভাত।'

তারপর আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কতদূর যাবেন?'

'হাওড়া—আপনি?'

'আমিও তাই। আপনি কি কাশী থেকে আসছেন?'

উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল্ এসেছি; আবার আজই যাচ্ছি।'

'কাজে এসেছিলেন বুঝি?'

'না—ঠিক কাজে নয়, একজনকে পৌঁছে দিতে এসেছিলুম।'

ইহার পর দ্রুত আলাপ জমিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম—ইঁহাদের গতিবিধি এবং সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার অনুমানই ঠিক। ইঁহাদের সঙ্গের আর একটি মহিলার পরিচয় আগে বুঝিতে পারি নাই। এখন শুনিলাম, ইঁহাদেরই গ্রামে তাঁর বাড়ী, এক সঙ্গে তীর্থ দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। সাঁতরাগাছিতে ইঁহাদের সকলকার বাড়ী।

এটোয়া-ফেরৎ যুবকটির সহিতও একটু একটু করিয়া আলাপ হইল। ছেলেটির নাম বাদল। বি-এ পাস করিয়া কোন একটা ফার্ম্মে চাকরী করে, সন্ধ্যায় আইনও পড়ে। তাহাদের পৈত্রিক বাড়ী ভবানীপুরে। ছেলেটির দেখিলাম, বৌদি-অন্তপ্রাণ। বৌদি যে এটোয়াতে পড়িয়া থাকেন, তা তাহার মোটেই ইচ্ছা নয়। কিন্তু দাদাকেই বা অত মোটা মাহিনার কাজ ছাড়িতে বলে কেমন করিয়া?

চতুর্দোলা

বাদল ছেলেটি বড় সরল। সে একটু পরিচয়টা জমিয়া উঠিতেই গড় গড় করিয়া তাহার যত কিছু প্রাণের কথা বলিয়া চলিল, 'কী বললেন, আপনার বাড়ী ঢাকুরে? বৌদিদির বাপের বাড়ী ত ঐখানেই, একটা ষ্টেশন পরে—যাদবপুরে। বৌদি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন সেকালে—জানেন? আমার ঐ ছোট বোনটি—ওতো ডাকসাইটে গাইয়ে। অনেকগুলো রেকর্ড আছে ওর। কী যে বাবা ওর এক বিয়ে দিলেন সেই ধাধধাড়া গোবিন্দপুরে—বাগনান থেকে নেমে তিন মাইল যেতে হয়—সেখানে গিয়ে না রইল গানের চর্চ্চা আর না রইল স্বাস্থ্য। দেখুন না, ম্যালেরিয়া ধ'রে একেবারে ত মরতে বসেছিল।'

আবার একটু পরেই শুরু করিল, 'আইন পড়ছি বটে, জানেন ওকালতি করবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই। চাকরী ত নয়ই—'

প্রশ্ন করিলাম, 'তবে কি করতে চান?'

'সে শুনলে আপনারা হাসবেন। আমার ইচ্ছা ভাল লোক পেলে ম্যাজিক শিখি। একেবারে কাঁচা পয়সা মশাই, যাকে বলে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে খাওয়া। স্রেফ লোক ঠকিয়ে পয়সা নেওয়া, মজা নয়? তা ছাড়া কত দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো যায় পরের পয়সায়—বেশ প্রোফেসন, না দাদা? ঐ দেখুন না, পি সি সরকার কী পয়সাটাই না কামাচ্ছে। কী খাটুনী? কিচ্ছু না!'

সাঁতরাগাছির ভদ্রলোকের নাম কেদার। কেদারবাবু বাদলের চেয়ে বোধ হয় বছর তিন-চারেকের বড়ই হইবেন কিম্বা আর একটু বেশী। তিনি কি একটা সরকারী চাকুরী করেন। মাত্র বছর তিনেক হইল ঢুকিয়াছেন, সেই জন্যই বেশী দিন ছুটি লইতে সাহস করেন না। ছুটি লইলে কর্ত্তারা মনে করেন, ফাঁকীবাজ—চাকরীতে উন্নতি হয় না। তাঁহার আশা সাব-অর্ডিনেট এ্যাকাউণ্টস সার্ভিস পাস করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন, সেখান হইতে অফিসার।

দেশ-বিদেশ বেড়ানোর সখ বিশেষ নাই। ভালও লাগে না, দলে পড়িয়া আসা।

পাশের বেঞ্চের মাদ্রাজী ভদ্রলোকও একরকম গায়ে পড়িয়াই আলাপ করিলেন। তিনি কি একটা মিলিটারী কনট্রাক্টের আশায় দিল্লী গিয়াছিলেন। অমনি বেড়ানোও হইবে এই জন্য তাঁহার স্ত্রী সঙ্গ ছাড়েন নাই।

কথায় কথায় এই যে ট্রেণে এত ভিড়, এ সম্বন্ধে সরকারের ঔদাসীন্য—ইহার উপরে ছোটখাটো একটি বক্তৃতাও করিলেন। আমরা নির্জ্জীব, আমরা আমাদের অধিকার দাবী করিতে পারি না, সেই জন্যই এত কষ্ট পাই—এই তাঁহার মত। খবরের কাগজে একখানা চিঠি লিখিতেও আমাদের গায়ে জ্বর আসে, তা দাবী করিব কি। ইত্যাদি—

ইতিমধ্যে সাসারাম প্রভৃতি আরও গোটা দুই স্টেশন ছাড়াইয়া গেল। ওপাশে একটি মারোয়াড়ীর সহিত একটি সিন্ধী ভদ্রলোকের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে একটা আলোচনা জমিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মের গন্ধ পাইয়া অনেকেই সেদিকে ঝুঁকিয়াছেন। একটি শিখ একটা উর্দ্দু সংবাদপত্র হইতে একজন কাবুলিওয়ালাকে কী একটা সংবাদ পড়িয়া শোনাইতেছেন এবং সংবাদের মর্ম্মার্থটা বোঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। একেবারে ঐধারের উড়িয়া দম্পতিটির সহিত একজন শিখের দারুণ একটা কলহ বাধিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। এখন গভীর শান্তি বিরাজ করিতেছে। মধ্যেকার স্টেশনে কয়েকজন যাত্রী উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু দ্বাররক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় উঠিতে পারে নাই। সে জন্য যেন কতকটা খুশীই আছি—কিছু পূর্ব্বেকার নিজের অবস্থা অবশ্য এখন আর মনে থাকা সম্ভব নয়।

বাদলদের সহিত আলাপটা ইহার মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

বাদলের বৌদি ও বোনের সহিত কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। বৌদি মেয়েটি সত্যই অসাধারণ—ছোট দেবর ও ননদটির সম্বন্ধে স্নেহের ও উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। বয়স বেশী নয়, সঙ্গের ঐ তিন বছরের ছেলেটিই তাঁর প্রথম সন্তান। তবু ইহারই মধ্যে তিনি দেবর ও ননদের জননীর স্থান পূর্ণ করিয়া বসিয়াছেন। স্নেহ ও করুণার অপূর্ব্ব অঞ্জনে তাঁহার সুশ্রী মুখ যেন অসাধারণ সুন্দর দেখাইতেছিল। বৌদি ইতিমধ্যেই কোথায় কোন্ স্টেশনে চা সংগ্রহ করিয়া ফ্ল্যাস্কে রাখিয়া দিয়াছিলেন—এখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে গ্লাসে ও কাপে করিয়া ভাগ করিয়া দিলেন। দুই টুকরা জেলি-মাখানো রুটি ও এক কাপ চা আমার কাছেও আসিয়া পৌছিল।

চায়ের পর্ব্ব শেষ হইলে একরকম মরিয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিলাম, 'বৌদি, প্রশ্রয় পেয়ে সাহস বেড়ে গেছে। যদি দেওরের কথাটা আস্পদ্দা বলে মনে না করেন ত একখানা গান শুনিয়ে দিন।'

তিনি লজ্জিত স্মিতমুখে কহিলেন, 'ঐ পাগলাটার কথা আপনি বিশ্বাস করলেন, ঠাকুরপো! গান গাইতে জানেন আমার এই ননদটি—অশোকা সেন, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

আমি মাথা-টাথা চুলকাইয়া বলিলাম, 'ওঁর গান ত শুনবই—মোদ্দা আপনাকেও ছাড়ছি না।'

আমাকে আর বেশী বলিতে হইল না। উৎসাহ দেখিলাম বাদলেরই বেশী। সে একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া অবশেষে বৌদিকে রাজী করাইল। বৌদি একখানি গান গাহিলেন—রবীন্দ্রনাথের গান। মোটের উপর গলা ভালই, হয় ত সুরে একটু আধটু ভুল থাকিতে পারে। এবার অশোকার পালা, কিন্তু তাহাকে অনুরোধ করিতে গিয়া থামিয়া গেলাম। সে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় সান্ধ্য প্রার্থনা করিতেছে তখন। দুই চক্ষু নিমীলিত, ওষ্ঠ দুইটি সামান্য একটু নড়িতেছে, হাত দুটি বুকের আঁচলের মধ্যে। বৌদি

আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, 'ও এখন ভগবানের নাম করছে ভাই—মিনিট কতক না গেলে কিছু বলা যাবে না। জপ করা এখনই শেষ হবে কিন্তু জপ করার পরও দশ-বারো মিনিট ও ভাল করে কথা কইতে পারে না।'

বিস্মিত হইয়া মেয়েটির দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম। খুবই অল্প বয়স, কুড়ী বাইশের বেশী হইবে না। রোগশীর্ণ মুখের পাণ্ডুরতা একেবারে নষ্ট না হইলেও মেয়েটি যে সুশ্রী তাহা বুঝা যায় কিন্তু তবু কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত সে মুখে অসাধারণত্ব কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। অথচ এখন এমন একটি ভক্তি-তদ্‌গত ভাব মুখখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে যে, সে দিকে চাহিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। আমার আশে পাশে যাঁহারা ছিলেন—কেদার বাবু প্রভৃতি—তাঁহারাও দেখিলাম সসম্ভ্রমে চাহিয়া আছেন। এই যে প্রার্থনা ঐ সুন্দর ওষ্ঠ দুইটিকে কম্পিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বাহির হইয়া আসিতেছে—উহা হয় ত পৃথিবীর কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালীর অনুমোদিত প্রার্থনা নয়, বীজমন্ত্রও নয়—তবু তাহার আন্তরিকতা ও ভক্তিতে যে সেটি সত্য হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে চাহিলে সে সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকে না।

বৌদি চুপি চুপি বলিলেন, 'অমনি ওর ছেলেবেলা থেকেই। কেউ কীর্ত্তন গাইতে এলে তিন বছরের মেয়ে ছুটে তার সঙ্গে বেরিয়ে যেত। পাঁচ ছ বছর বয়সেই তিন চার দিন রামকমলের কীর্ত্তন শুনতে গিয়ে ভাব-সমাধি হয়েছিল। ······কি কষ্টে যে বাবা ওর বিয়ে দিয়েছেন। কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না—শেষে এইখানে এদের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন—এই সব বলে তবে রাজী করানো হল। সাধ করে কি আর ঐ ম্যালেরিয়ার দেশে দিয়েছি? এখনকার দিনে ওর মনের মত ধার্ম্মিক বাড়ী কোথায় পাবো বলুন?'

প্রশ্ন করিলাম, 'স্বামীটি কেমন?'

'সে এমনি সাধারণ ছেলে, তবে ওর ও-সব নিয়ে কখনো ঠাট্টা-তামাসা করে না। তাতে করে কোন অশান্তি নেই ওদের মধ্যে—এই অবধি বলতে পারি।'

ঠাট্টা-তামাসা করা যে সম্ভব নয় তা মেয়েটির দিকে চাহিলেই বোঝা যায়। একটু পরে অশোকা এদিকে ফিরিয়া, আমাদের সকলের দৃষ্টিই শ্রদ্ধায় তাহার দিকে স্থির হইয়া আছে দেখিয়া যেন কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িল। বৌদি বলিলেন, 'এরা তোর গান শুনবেন বলে অপেক্ষা করে আছেন।'

অশোকা আরও লজ্জিত বোধ করিল। তবে বেশীক্ষণ পীড়াপীড়িও করিতে হইল না। রবীন্দ্রনাথেরই একটা গান ধরিল। গলা খুবই মিষ্ট—তবে ঝিম। চলন্ত গাড়ীতে একটু অসুবিধা হইবার কথা। যেটা ধরিল সেটা বেহাগ সুরের গান—সন্ধ্যার সময়ে হয় ত বেহাগ ধরা উচিত হয় নাই তবুও সবটা জড়াইয়া একটি ভক্তিনম্র চিত্তের আকুল প্রার্থনা হিসাবে সে সময়ে আমাদের সকলকেই গভীরভাবে অভিভূত করিল। আজ এতদিন পরেও যখনই চোখ বুজিয়া কথাটা ভাবিতে চেষ্টা করি, গানের দুই-একটি কলি সেই আন্তরিক আকুলতাসুদ্ধ যেন কানের কাছে বাজিয়া ওঠে—

'রুদ্ধদ্বারের বাহিরে একেলা আমি,
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী,
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো !
অন্তরে মোর সঙ্গীত দাও আনি—
নীরব রেখোনা তোমার বীণার বাণী !
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো !'

আমাদের গানের পর্ব্ব বোধ হয় পাশের মাদ্রাজী ভদ্রলোকটির ভালো লাগে নাই। আমরা যখন সুরের সেই বিহ্বল করা আঘাতে ভিতরে বাহিরে থম থম করিতেছি, সেই সুযোগে তিনি পকেট হইতে এক জোড়া তাস বাহির করিয়া কহিলেন, 'আসুন না, একটু তাস খেলা যাক্।'

প্রথমটা বিরক্ত হইয়াই উঠিলাম কিন্তু তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া নরম হইতে

হইল। তার উপর বেচারী বাদল ছেলেমানুষ, তাহার বোধ হয় এত ভারী আবহাওয়া সহ্য হয় না—সেও ঝুঁকিয়া পড়িল, 'খেলুন না, মন্দ কি।'

আমি, বাদল, কেদার বাবু ও সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি বাক্সটিকে টেবিল করিয়া বসিলাম। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে বেঞ্চিতেই প্রমোশন পাইয়াছি। চলিল কিছুক্ষণ তাস খেলা। আমার ঠিক তাস খেলায় মন ছিল না, তাহার উপর বাদল বসিয়াছিল আমার সঙ্গে—সে একেবারে কাঁচা খেলোয়াড়, সুতরাং আমরাই হারিতে লাগিলাম! তাহাতে মাদ্রাজী ভদ্রলোকের বিজয়গর্ব্বের সহিত আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। চট করিয়া খেলা ছাড়িতেও পারিলাম না।

অশোকা অন্ধকারে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে সুদূরাগত বংশীধ্বনির মত তাহার সুরের গুঞ্জন ভাসিয়া আসিতেছে কানে। বৌদি কেদারবাবুর মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। তাঁহার বাপের বাড়ীর গল্প, এটোয়ার গল্প, শ্বশুর বাড়ীর গল্প। তাহারও দুই একটি কথা শুনিতে পাইতেছি। ওধারে একটি মারাঠী মহিলা বার-দুই বমি করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিব্রত স্বামীর মুখে শুনিলাম, ট্রেণে উঠিলেই নাকি এই রকম হয়। গাড়ীশুদ্ধ লোক নানা উপদেশ বর্ষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু একটি পাঞ্জাবী মহিলা দেখিলা। কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া ভিড় ঠেলিয়া কাছে গিয়া বসিলেন এবং মূর্চ্ছিতা মহিলাটির মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া শুশ্রূষায় লাগিয়া গেলেন। মারোয়াড়ী ভদ্রলোকটি, যেন তাঁহারই একটা দায়িত্ব কাটিয়া গেল—এই সুরে বলিয়া উঠিলেন, 'জয় রামজী কি!'

এই সব ছোটখাটো নাটকের মধ্য দিয়া আমাদের তাসখেলা কিন্তু ঠিকই চলিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে গাড়ীর সবাই এক রকম করিয়া বসিয়াছে। পথের মাঝখানে ও দরজার ধারে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কেহ বা সেইখানেই মালের উপর জায়গা করিয়া লইয়াছেন, কেহ বা বেঞ্চির মধ্যেকার ফাঁকগুলি ভরাইয়াছেন। মজার কথা এই যে, ঘণ্টা-তিনেক পূর্ব্বে যাঁহারা অপরে

দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়াও প্রাণপণে নিজেদের আশে পাশে স্থান জোড়া করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে সেইসব লোককেই ডাকিয়া কাছে বসাইয়াছেন। উড়িয়া ভদ্রলোকটি স্থান দখল করার জন্য একজন শিখের সহিত তখন দারুণ বিবাদ বাধাইয়াছিলেন। এখন আবার তাহার সহিতই তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে চেঁচামেচি হইয়া গেল। অর্থাৎ তিনি যত বার শিখ ভদ্রলোকটিকে আরাম করিয়া বসার জন্য অনুরোধ করেন, শিখটি ততই যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া বসেন।

আশ্চর্য্য, এইটুকুর মধ্যে কত নাটকই দেখিলাম। এই এত হৃদ্যতা—অথচ স্টেশনে স্টেশনে যখনই নূতন মানুষ ওঠে তখনই কী অপ্রীতিকর চেঁচামেচি না শুরু হয়!···মানুষের সারাজীবনটাই বুঝি এই—নবাগতকে কিছুতে কোন ক্ষেত্রে স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না, তাহাকে নিজেকেই করিয়া লইতে হয়। কিন্তু একবার সেই নবাগত পুরাতন হইয়া গেলে অনায়াসে কেমন করিয়া পুরাতনের সঙ্গে মিশিয়া উত্তরকালের নবাগতকে কোণ-ঠাসা করিবার চেষ্টা করে।

রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর কলগুঞ্জন নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। সবাই ঢুলিতেছে, কেহ বা উহারই মধ্যে কোমরটা হেলাইয়া পা ছড়াইবার একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। আমাদের সঙ্গের মহিলাগুলির গল্প-গুজবও কখন থামিয়া গিয়াছে। অবশেষে একেবারে গয়া স্টেশনে গাড়ী আসিতে আমরা তাস বন্ধ করিলাম। দুই একজন নামিয়া গেলেন—আবার দুই চারিজন উঠিলেনও। আবার একটা অপ্রীতিকর কোলাহলের সৃষ্টি হইল, তবে এবারে বেশী নয়। নবাগতদের সহিত ঠিক আগের প্রীতির সম্পর্ক আর গড়িয়া ওঠা সম্ভব হইল না, কারণ রাত্রি তখন গভীর হইয়াছে। অধিকাংশ লোকই তন্দ্রাতুর, কেহ বা রসদ অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত।

আমিও তাস ফেলিয়া খাবার কিনিবার চেষ্টায় এদিক ওদিক তাকাইতে-

ছিলাম। বৌদি ব্যাপারটা বুঝিয়া, চট্ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, 'ছিঃ ভাই ঠাকুরপো, আমাদের সঙ্গে বিস্তর খাবার আছে। আর তা না থাকলেও—যা আছে তাই সবাই ভাগ করে খেতুম, না হয় একটু করে কমই প'ড়ত !'

আমি আর প্রতিবাদ করিলাম না। করিবার অসুবিধাও ছিল, দরজার কাছে একটা ঠেলাঠেলি মারামারি চলিয়াছেই। নবাগতরা তখনও ভাল করিয়া ভিতরে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্য দিয়া খাবার সংগ্রহ করাও কঠিন। ধারের বেঞ্চে মহিলারা বসিয়া আছেন, সেখানেও সুবিধা ছিল না।

কেদার বাবুরাও খাবার বাহির করিলেন। বৌদি সঙ্গে সঙ্গে রুল জারি করিলেন যে, দুইবাড়ীর খাবার মিলাইয়া আমরা সবাই খাইব। সকলেই তাহাতে রাজী—এ যেন কতকটা বন-ভোজনের আনন্দ। কেদার বাবুর মা ও সঙ্গের প্রৌঢ়া মহিলাটি কিছু খাইবেন না। শুধু তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী ও আমরা কয়জন। হাতে হাতে পাতা দিয়া বৌদি নিপুণতার সহিত সব খাবার সমান ভাগ করিয়া দিলেন। লুচি, ডালপুরী, ভাজা, আলুর তরকারী, পেঁড়া, মিঠাই কত কি! আমি এসব ব্যাপারে বরাবরই অপটু, অতগুলো খাবার পাতাসুদ্ধ হাতে রাখিয়া খাওয়ার অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া বৌদি সহসা পাতাটা আমার হাত হইতে টানিয়া লইলেন। তারপর যতক্ষণ ধরিয়া আমি খাইলাম, তিনি হাতে করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি টেবিলের মত তাঁহার হাতের উপর হইতে খাবার লইয়া খাইতে লাগিলাম। এধারে অশোকা বেচারী দুই হাতে দুইটা জলের গ্লাস লইয়া বসিয়া। নীচে রাখিবার স্থান নাই। আমাদের প্রয়োজনমত তাহার হাত হইতেই লইতে হইবে।

খাইতে খাইতে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলাম, 'বৌদি, প্রশ্রয় যা দিলেন আর ছাড়ছি না। এর পর এটোয়ায় গিয়ে উৎপাত করে আসব।'

স্মিত-প্রসন্নমুখে বৌদি কহিলেন, 'যাবেন বৈ কি ভাই। তার আগে কলকাতায় ত কদিন আছি, একদিন নিশ্চয় আসবেন। আসবেন ত?'

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়ই'।

অশোকা কহিল, 'একদিন আমার ওখানেও যেতে হবে।'

'সে আর বলতে হবে কেন ভাই, আমি বাদলের কাছ থেকে সব ঠিকানা লিখে নেব। আমারটাও দিয়ে দেব, কেমন? একদিন সবাই চলে আসবেন?'

আহারাদির পর কিন্তু আর গল্প তেমন জমিল না। কেদার বাবু ও বাদল টানাটানি করিয়া উপর হইতে বাক্স-বিছানা নামাইয়া দু'টা বেঞ্চির ফাঁক ভরাট করিয়া লইয়া তাহাতেই নিজেরা একটু একটু কাত হইল—ইতিমধ্যে উপরের বাঙ্কে একটু হেলান দিয়া বসিবার মত স্থান হইয়াছে দেখিয়া আমি সেখানেই উঠিয়া গেলাম। আরাম চাই না—তবু চোখটা আর না বুজিয়া যেন পারা যাইতেছে না!···

সকাল হইল। আটটা কত মিনিটে তুফান এক্সপ্রেস হাওড়া পৌঁছিবে। এই সময়টা যেন কার কাটে না। রাত্রে কাহারও সুনিদ্রা হয় নাই, যেমন তেমন করিয়া শোওয়ার জন্য সকলকারই মনের ভাবটা এই যে, বাকী সময়টা হাতে করিয়া সরাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। মেয়েরা বিরসমুখে বসিয়া—পুরুষেরা বিরক্ত।

গল্প আর কিছুতেই যেন জমে না। এপাশে ওপাশে গত রাত্রির অন্তরঙ্গতার সুর ধরিয়া দু'টা একটা কথা ওঠে কিন্তু বেশীদূর যায় না—মধ্যপথেই থামিয়া যায়। ওপাশের মারোয়াড়ী ভদ্রলোকটি আর একবার বেদান্তের কথাটা তুলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু অপর পক্ষ হইতে কিছুমাত্র সাড়া মিলিল না।

কথা যা' ওঠে তা' ঐ গাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই। কেহ হয়ত প্রশ্ন করে আর কত মাইল আছে, আর একজন উত্তর দেয়। কেহবা মন্তব্য করে গাড়ী অস্বাভাবিক আস্তে যাইতেছে, কেহ ঘড়ি দেখিয়া মিলাইতে বসে লেট হইবে কি না।

এই কথাটাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কাল হইতে কত লোক উঠিল, কত নামিল। কত শত্রুতা কত অন্তরঙ্গতায় রূপান্তরিত হইল, কত আক্রোশ শুভবুদ্ধির উৎকণ্ঠায় মিশিয়া গেল। কিন্তু আবার যেমন গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিলাম সকলে যেন পুনরায় সেই পূর্ব্বেকার দূরত্বে সরিয়া গেল—কোথা হইতে কী করিয়া যে এই ব্যবধান রচিত হইল তা বোঝাও গেল না। ছুদণ্ডের মুসাফিরির সহিত জীবনের মুসাফিরি বোধ করি একই সূত্রে গাঁথা—আসলে সবাই পর, সকলে নিজের লক্ষ্য এবং গন্তব্য লইয়াই ব্যস্ত, সকলে নিজের স্বার্থটির বৃত্তেই অহরহ ঘুরপাক্ খাইতেছে।

অবশেষে বেলুড় আসিয়া পড়িল। সাজ-সাজ বাঁধ-বাঁধ রব চারিদিকে। আমি নামিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইলাম। এক মুহূর্ত্তও না দেরি হয়। কেদারবাবু মালপত্র মিলাইতে লাগিলেন। বৌদি ছড়ানো জিনিষপত্র অশোকা ও বাদলের সহিত হিসাব করিয়া গুছাইতে ব্যস্ত।

সব জিনিষ সামলাইবার আগেই এক সময়ে হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম্মে গাড়ী প্রবেশ করিল। তখন শুধু নামিবার চেষ্টা—"কুলী" "কুলী" করিয়া প্রাণপণে ডাকাডাকি। সারাপথ যাহার সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গতায় কাটিল, নিজের মাল না লইয়া সামনের কোন কুলী তাহার মাল নামাইলে মহা রাগারাগি—বিরক্তি।

আমিও সেই সব ঠেলাঠেলি গণ্ডগোলের মধ্যে এক জায়গায় একটু ফাঁক পাইয়া নামিয়া পড়িলাম। সঙ্গে মালের বিশেষ হাঙ্গামা নাই—শুধু স্যুটকেশ, সুতরাং কুলীর শরণাপন্ন না হইলেও চলিবে। নামিবার সময়ে মাথার মধ্যে যে

কথাটা সব চেয়ে আগে ছিল—সেটা হইতেছে কতক্ষণে এই ভিড় ঠেলিয়া স্টেশন হইতে বাহির হইতে পারিব। তাই আর কোন কথা মনে পড়ে নাই। অনেকটা চলিয়া আসিবার পর খেয়াল হইল, ঐ যা! বাদলদের ত বলিয়া আসা হইল না! শুধু তাই নয়—উহাদের ঠিকানাগুলিও লওয়া হয় নাই।

মনে মনে লজ্জিত বোধ করিলাম। কিন্তু সে ভিড়ে আবার ফিরিয়া যাওয়া মুস্কিল। মনকে প্রবোধ দিলাম, এটোয়ার ঠিকানাটা ত মনে আছে, বৌদির স্বামীর নামও জানি। এটোয়াতে চিঠি দিলেই চলিবে।

কিন্তু আর তাঁহাকে কোনদিনই চিঠি দেওয়া হয় নাই। রাস্তাঘাটেও বাদলদের সহিত দেখা হয় নাই কোনদিন। এখন হয়ত আর দেখিলেও চিনিতে পারিব না।

জীবনের মূল্য

অজয় স্টেশনের বাইরে এসে একবার ক্লান্ত ভাবে তাকাল চারিদিকে। দীর্ঘ তিন বৎসর পরে ছাড়া পেয়েছে সে—আবার স্বাধীনভাবে পৃথিবীর আলো দেখছে। তার চেয়েও বড় কথা, তার প্রিয় শহর কলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়াতে পেরেছে—তবু কোথাও ওর মনের মধ্যে যেন উৎসাহ নেই।

এর মধ্যে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে। জার্ম্মানী যুদ্ধে হেরেছে, জাপানও তাই—যে প্রচণ্ড শক্তি-দুটি রণ-সজ্জার দম্ভে সারা পৃথিবী জয়ে নেমেছিল তারা আপাত-দুর্ব্বল প্রতিপক্ষের বৃহত্তর রণ-সজ্জা ও অস্ত্র-সম্ভারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অকস্মাৎ যে আলো পৃথিবীর দুই প্রান্তে উল্কার মত জ্বলে উঠেছিল তা বহু লোক ক্ষয় করে, অনেক রাজ্যের উত্থান-পতন ভাঙ্গা-গড়ার কারণ হয়ে, বহু শতাব্দীর জন্য পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দিয়ে আবার

নিভে গিয়েছে। তার সঙ্গে আরও অনেক জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা অমনি জ্বলে উঠেছিল—তারাও আজ ম্রিয়মাণ। আবার, যে সব ঘটনা কখনও পৃথিবীতে ঘটবে বলে কেউ আশা করেনি, এ যুদ্ধে তাও সম্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষের বুকের ওপরও এ যুদ্ধ অনেক ছাপ রেখে গেল বৈ কি! অনেক আঘাত তাকে সইতে হ'ল যা ভোলা বহু শত বৎসরের মধ্যে সম্ভব হবে কি না সন্দেহ! যদিও অজয় তাতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে পারেনি—সংবাদপত্র মারফত যেটুকু জানা সম্ভব—তাও সব সংবাদপত্র তাদের হাতে আসত না—আর দৈবাৎ বাইরে থেকে ঠিকরে-আসা গুজব, এরই ভেতর তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। তবে হ্যাঁ, মোটামুটি রাজনৈতিক খবরগুলো পেয়েছে সে। নেতারা মুক্তি পেয়েছেন, তাঁদের সিমলায় ডাকা হয়েছে আপোষ মীমাংসার জন্য (অজয় বরাবরই জানত এ চেষ্টার ফল কি হবে) এবং সে প্রচেষ্টা, সে আশা ব্যর্থ হয়েছে—সব খবরই পৌঁচেছে তার কাছে। ওদিকে পূর্ব্ব সীমান্তে ভারতের এক লাঞ্ছিত, দেশবাসী কর্তৃক দণ্ডিত জননেতা কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছিট্‌কে গিয়ে পড়ে অসম্ভবকে সম্ভব করবার যে প্রয়াস করেছেন বলে নানা রকম গুজব শোনা গিয়েছিল, এখন নাকি তাও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, আর তাই নিয়ে আসমুদ্র হিমাচল সারা ভারতে অভূতপূর্ব্ব এক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেক দিনের ঘুম থেকে জেগে ওঠা বৃদ্ধ জাতির প্রাণ অজ্ঞাত এক আবেগের স্পন্দনে থর থর করে কাঁপছে। এমন কি তারই জের কলকাতার এক রাজপথে মাত্র দু-তিন দিন আগে কী অঘটন ঘটিয়ে গেল, কী উত্তেজনার সৃষ্টি করে গেল—তাও অজয় শুনেছে প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে।

তবুও যেন ওর কিছুতেই উৎসাহ নেই। ওর প্রাণের ঘুম এর কোন আঘাতেই যেন ভাঙ্গা সম্ভব নয়। এই যে চারিদিকে অসংখ্য মানুষ, ওরই দেশবাসী কী একটা উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, চাপা একটা উৎসাহ ওদের চোখেমুখে, ওর প্রকৃত মূল্য কি অজয় তা জানে। নেতারা শিগ্‌গিরই

বাংলায় আসছেন ; অনেক দিন পরে কলকাতার আবার রাজনৈতিক জীবনের সাড়া পড়বে, শুরু হবে নতুন ঘটনা-প্রবাহ, কিছুদিন চারিদিকে হৈ-চৈ হবে, কতকগুলি লোক নিজেদের আবেগের প্রেরণায় ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়ত নতুন কোন কল্পনার স্রোতে, অসম্ভবের নেশায় উঠবে মেতে, তারপর আবার যে তিমির সেই তিমির। যে মরণ-শৈত্য জাতির মেরুদণ্ড বেয়ে নেমেছে তা আর তাকে বোধ হয় কোনদিন পরিত্যাগ করবে না।······যে ট্রেনে আসছিল ও, তারই কামরায় দুটি ছোকরা বলাবলি করছিল যে এর ভেতরে একদিন ডুব মারতে হবে অফিস থেকে। নেহেরু যেদিন আসবেন সেদিন স্টেশনে এসে তাঁকে দেখতে ত বেলা হবেই—সেদিন আর অপিসে যাওয়া সম্ভব হবে না—তার চেয়ে সেদিন বরং আগে থাকতেই দুটো সিনেমার টিকিট কাটা যাবে, তিনটে আর ছটার শো।······জননেতার দর্শন ও সিনেমা দেখা দুটোই তাদের কাছে সমান— শুধু একটু বৈচিত্র্য, শুধু একটা উত্তেজনা······ঐ যে ছাত্ররা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলেই 'জয় হিন্দ্' বলে অভিনন্দন জানাচ্ছে, মহাত্মাজীর দর্শনের জন্য যাদের আগ্রহ আর উৎসাহের শেষ নেই—তাদের প্রত্যেকের হাতেই বিদেশী সিগারেট, মুখে বিদেশী স্নো কিংবা ক্রীম। প্রত্যেকেরই পরণে পাতলা কলের ধুতি আর ছিটের জামা। এরা দিন রাতের অর্দ্ধেক সময় বোধহয় বৃথা অপব্যয় করে, তবু দশ মিনিটও কেউ চরকা কাটে না।

অকস্মাৎ অজয় যেন চমকে উঠল। এসব কী ভাবছে সে? এ কি কোন ব্যক্তিগত বেদনার কারণ তার মনে জাতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ জাগাচ্ছে! তবে কি সে নিজে যেটুকু দেশের কাজ করেছে তার জন্য অনুতপ্ত? সেটা কি তবে সময়ের অপব্যয়ই হয়েছে?

না-না-না, আপন মনেই বলে উঠল অজয়, ছি! এসব কথা ভাবাও পাপ।

সে যা করেছে তা যত সামান্যই হোক্ তার মূল্য একদিন তার দেশ নিশ্চয়ই পাবে। যেটুকু স্বার্থত্যাগ তাকে করতে হয়েছে, তার জন্য সে অন্তত অনুতপ্ত নয়।

অনুতাপ? না—এমন কি কোন অনুযোগও নেই তার। সে যে কাজ করেছে তার দায়িত্ব কতটা তা জেনেই করেছে। আশা যার ছিল না কোনদিন, তার আশাভঙ্গের ব্যথা অনুভব করার কথা নয়। এই মুমূর্ষু দেশে নিজেরা বেঁচে থাকাটাই সমস্যা—সেখানে প্রতিবেশীর স্ত্রী বা তার বুড়ী মার কী হলো তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে, এমন আশা করাটাই ত মূর্খতা।

মা! মার কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অজয়ের গলার কাছে কী যেন শক্ত-মত একটা ঠেলে উঠল। বড় দুর্ব্বল আর অসহায় ওর মা। বার্দ্ধক্যে আর শোকে কেমন যেন অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন—এতটুকু পরিশ্রমে এলিয়ে পড়েন, ক্ষিদে পেলে ছেলে-মানুষের মত কাঁদেন। স্বামী ও পাঁচটি সন্তানের শোক সহ্য করেছেন তিনি পর-পর, বয়সও প্রায় সত্তর হ'ল। এখনও যে বেঁচে আছেন, এইটেই আশ্চর্য্য। তার ওপর তাঁর ষষ্ঠ এবং শেষ সন্তান অজয়, তাকেই বা কতটুকু তিনি কাছে পেয়েছেন! সে শোক বোধ হয় তাঁর আরও বেশী।

একটা বড় রকমের দীর্ঘ নিঃশ্বাস অনেক চেষ্টায সামলে নিলে অজয়। মা কি ওর বেঁচে আছেন আর? আশা করতেও ভয় করে যেন। ত্রিশ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় সেই যে ও রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—তারপর আর ঘর-সংসার আত্মীয-স্বজন কোনদিকে তাকাবার অবকাশ পায়নি। সংসার ছোট ওর—মা, স্ত্রী, একটি মেয়ে এবং একটি বাপ-মা-মরা ভাগ্নী—তবে তাদেরও ত খরচা আছে। জমি-জমা ছিল সামান্যই—তাতে কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদন চালানোও দুষ্কর। এতদিন যে কী করে চলেছে তাও অজয়ের কাছে একটা মস্ত বিস্ময়। জেলে এলেই ওর এই কথাগুলো

মনে পড়ে, মনে পড়ে বাড়ীতে যখন দ্বিতীয় পুরুষ নেই, তখন এতগুলি প্রাণীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাই তার সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। মনে মনে সংকল্প করে প্রত্যেক বারই যে, এবার বেরিয়ে ও উপার্জ্জনের দিকেই মন দেবে কিন্তু বেরোলে আর সে সংকল্পকে কাজে পরিণত করবার অবসর পায় না। একটা কাজ থেকে আর একটা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তা ছাড়া বাইরে থাকেই বা কতটুকু—হয় জেল, নয় অন্তরীণ, এই ত ওর অধিকাংশ সময়ের ইতিহাস।

অবশ্য একচল্লিশ সালে শেষবার ছাড়া পেয়ে ও সত্যি সত্যিই উপার্জ্জনে মন দিয়েছিল। উপায়ও ছিল না না-দিয়ে, কারণ যেটুকু জমিজমা ছিল তা ইতিমধ্যেই বেচতে হয়েছিল ওদের—তখন বাইরে থেকে কিছু না এলে উপবাস করতে হ'ত। অবশ্য সরকারী চাকরী ও নেয়নি, স্থানীয় স্কুলের নিচু ক্লাসের শিক্ষক, এই হ'ল ওর পদবী। মাইনে তদনুপাতেই কম—তবু তাতেই দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটত।

তারপর এল বিয়াল্লিশ সালের অগাষ্ট মাস। চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠল! সে আগুনে অজয় ঝাঁপিয়ে পড়েনি—পড়বার উপায়ও ছিল না—কিন্তু তাতেও অব্যাহতি পেলে না ও, নানা কারণে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ পড়ল অনেক বারের দাগী, মার্কামারা দেশ-সেবকের ওপর, অজয়কে আবার গিয়ে ঢুকতে হ'ল কারাপ্রাচীরের মধ্যে।

এবারে সে কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না—সেইজন্যই বোধ হয় ছিল নিশ্চিন্ত, এত বড় বিপদের কোন রকম আভাস পর্য্যন্ত পায়নি বেচারী! তাই অকস্মাৎ যেদিন সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তাকে, সেদিন কোন রকম নির্দ্দেশই ও দিতে পারেনি, শুধু বিদায়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে স্ত্রীর হাত ধরে বলেছিল, 'তুমি রইলে, এই আমার সব চেয়ে বড় ভরসা মিনু। কোন উপায়, কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না, ভেবেও কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না, তবু

জানি তুমি যেমন করেই হোক্ এদের বাঁচিয়ে রাখবে। অন্তত মাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো মিনু—ফিরে এসে যেন দেখতে পাই।'

একথা ওর স্ত্রীকে বলবার সেদিন কোন অধিকার ওর ছিল না, এমন দাবী করাও হয়ত অপরাধ, তবু ভরসা সেদিন ও সত্যই করেছিল।

ওর স্ত্রী, ওর মিনু, মিনতি—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য মেয়ে। বিয়ে করেছিলো অজয় মিনুকে না দেখেই—হঠাৎ একটা বড় কাজের ফাঁকে, নিতান্ত কয়েক ঘণ্টার নোটিশে। বিয়ে করা যে ওর পক্ষে অন্যায় তা অজয় ভাল করেই জানত কিন্তু ওর মা সব ঠিক করে যখন ওকে ধরে বসলেন, কান্নাকাটি করতে লাগলেন, তখন শোকার্ত্তা মাকে ও না বলতে পারেনি কিছুতেই। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে—অপরাধীর মতই পিঁড়েয় গিয়ে বসেছিল।

কিন্তু আজ আর একথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই—আজ ও গর্ব্বের সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করতে পারে যে, মায়ের কথা শুনে সেদিন ও ভালই করেছিল। মিনু তাকে অনুতপ্ত হবার এতটুকু অবসর দেয়নি কখনও। শুধু যে সে রূপসী, তার স্বভাব মিষ্ট, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাই নয়—সে কোনদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও অজয়ের কাজে বাধা দেয়নি, একবারও ঘরের মধ্যে, সংসারের মধ্যে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করেনি। বরং গৃহস্থালীর শত অভাব-অভিযোগ, জীবন-যাত্রার সহস্র রকমের বিড়ম্বনা থেকে প্রাণপণেই অজয়কে আড়াল করে রাখত। ওদের দারিদ্র্যের নগ্ন চেহারাটা তাকে একদিনও দেখতে দেয়নি! কী করে যে সে সংসার চালাত আজও ভেবে পায় না অজয়। ওর মনে হ'ত মিনু জাদু জানে, আজও তাই মনে হয়।

তবু সমস্ত শক্তিরই একটা সীমা আছে। ও জেলে যাবার পর যে সব ঘটনা ঘটল তাতে কোন আশা রাখাই বিড়ম্বনা। ঝড়, জল-প্লাবন, দুর্ভিক্ষ। ঈশ্বর ও মানুষের সমস্ত শক্তি যেন নিয়োজিত হ'য়েছিল তাদের পরীক্ষা করবার জন্যই। দেশে খাদ্য নেই—বস্ত্র নেই, একান্ত যা প্রয়োজন জীবন-যাত্রার পক্ষে—তারও

মূল্য চারগুণ, পাঁচগুণ এমন কি কোথাও কোথাও আরও বেশী উঠে গেল। দুর্ভিক্ষের সময় চাল ছাড়া অন্য সব জিনিষের যে দাম ছিল দুর্ভিক্ষের পরও কিছু মাত্র কমল না, বরং বেড়ে গেল।

জেল থেকে এ সব খবরই পেতো অজয়! শুনত আর শিউরে উঠত। তার কোন সঙ্গতি নেই—তার পরিবারের লোককে বাঁচিয়ে রাখা বোধ হয় জাদুবিদ্যারও অসাধ্য কাজ। বাড়ীর খবর সে পেত না—পাবার চেষ্টাও করত না। দেখা করতে তাদের বলবে সে কোন্ লজ্জায়? গাড়ী ভাড়া দেবে কে? তাছাড়া দেখা হলে বলবেই বা কি? কোন মুখে সে তাদের দিকে চাইবে?

বহুদিন আবেদন-নিবেদনের পর সামান্য একটা ভাতা তার সংসারের জন্য মঞ্জুর হয়েছিলো বটে কিন্তু সে টাকায় একটা লোকও একমাস খেতে পায় না। তবুও যখন সে টাকা মঞ্জুর হ'ল তখন দুর্ভিক্ষ পার হয়েও এক বছর প্রায় কেটে গেছে। হয়ত তখন আর কেউই বেঁচে নেই। টাকা যাওয়াটাই বোধ হয় তখন সব চেয়ে পরিহাসের ব্যাপার।

অজয় দ্রুতগতিতে স্টেশন পেরিয়ে নেমে এল রাস্তায়। কিছুতেই ভাববে না সে। সব চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে মস্তিষ্ককে শান্ত এবং সুস্থ রাখবে। পৃথিবীর সব ভারই ত কিছু তার ওপর নেই। এই যে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল মন্বন্তরে, না হয় তার মা, তার স্ত্রীও তাদের সেই অসংখ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে! তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে?—

রাস্তায় পড়ে জনতার উত্তেজনার ঢেউ তার প্রাণেও আঘাত করল। সে যেন জোর ক'রে—এক ঝাঁকানিতে মন থেকে সব অন্ধকার ঝেড়ে ফেলে দিলে। মহাত্মাজী আসছেন বাংলা দেশে, নতুন ক'রে আবার তাদের জাতীয় জীবন শুরু করতে হবে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাববার অবসর নেই—

কোথায় যাবে—তা সে ইতিপূর্ব্বে ভাবেনি। কলকাতায় তার বন্ধুবান্ধব সহকর্ম্মী হয়ত দুচার জন এখন আছে। খোঁজ করলে দেখা মিলতে পারে। কিন্তু তাদের কারুর কাছেই যেতে ইচ্ছা করল না। মনে মনে সকলকার মুখগুলো একবার ভেবে নিয়ে সে সোজা হাওড়া স্টেশনের পথই ধরলে! দেশেই যাবে সে, শুধু যে সেটা তার কর্ত্তব্য তাই নয়—সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানোটা প্রয়োজন। যা কিছু চরম অপ্রিয় তা সে জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। যদিই কোন অবিশ্বাস্য উপায়ে তারা এখনও বেঁচে থাকে, অবশ্য এটা যে সম্ভব নয় তা সে জানে, তবে যদি একজনও বেঁচে থাকে, তাহ'লেও তার কর্ত্তব্য থাক্‌বে আবার তার ভার নিজের হাতে তুলে নেওয়া। আর যদি আশঙ্কাই সত্য হয়? তাই বা মন্দ কি! শান্ত মনে, কোন পিছটান্ না রেখে আবার সে দেশের পূজায় নিজেকে সঁপে দেবে নিঃশেষে, নির্ম্মমভাবে।

ট্রেন থেকে যখন আবার নামল অজয়, তখন সবে ভোর হচ্ছে। আগের দিন কিছুই খাওয়া হয়নি, দেহ ক্লান্ত। মনও—যতই সে কোন কথা না ভাববার চেষ্টা করুক, অস্পষ্টভাবে সমস্ত চরম সম্ভাবনাগুলো ভেবে ভেবে অবসন্ন। তবু নামতে হয়। কাউকে প্রশ্ন করবারও সাহস নেই—সোজা বাড়ীর দিকে যাবারও না। যদি সেখানকার কোন চিহ্নই না থাকে? কিন্তু খবর নেওয়া আরও অসম্ভব। কারুর সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হলে, প্রশ্ন না করে যদি সংবাদটার আভাস পাওয়া যায় তাহলেই ভালো, সে যে প্রস্তুত নেই দুঃসংবাদ শোনবার জন্য, এটা সে কিছুতেই জানাতে পারবে না, তার চেয়ে বড় লজ্জা যেন আর কিছুই নেই।

গ্রামেরও চেহারা পাল্‌টে গেছে বৈকি!

বিয়াল্লিশ সালে কিছু আগুনে পুড়েছে, কিছু ঝড়ে গেছে নষ্ট হয়ে তারপর। সবই নতুন। ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট—যেদিকে দৃষ্টি যায় পরিচিত কিছুই নেই।

মন্দ নয়! আপন মনেই হেসে উঠল অজয়। বিকৃত, উন্মাদের হাসি! মন্দ নয়, নতুন করে জীবন আরম্ভ করবার সূচনাটা ভালই।

স্টেশনের বাইরেই কার বিরাট বাড়ী উঠেছে। দোতলা বাড়ী, তিনতলা উঠছে। এত পয়সা কার হ'ল কে জানে? গ্রামে দুটিমাত্র পাকা বাড়ী ছিল, তাও একতলা। যেখানে আগে একটা খাবার-মনোহারী-চায়ের মিলিত দোকান ছিল, এখনও সেখানে তা আছে, তবে চালাটা আরও বড়, নতুন। পাশে আর একটা কী দোকান হয়েছে কিন্তু সবাই অপরিচিত। পুরোনো দোকানদারও কেউ নেই।

চায়ের দোকানটা পেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল অজয়। চা খাওয়ার যে খুব ইচ্ছা আছে তা নয়—যদি সংবাদটা পাওয়া যায় এই আশা তার। তা ছাড়া পা কাঁপছে দুর্ব্বলতায় থর্ থর্ করে। কিছু একটা পেটে পড়া দরকার—

দোকানদার একটু বিস্মিত হযেই প্রশ্ন করলে, 'শুধু চা?'

'হ্যাঁ।' ক্লান্ত বিরক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে অজয়। তার-বেশী কিছু খাবার মত পয়সা ওর নেই।

চা খেতে খেতে প্রশ্ন করলে, 'এ বাড়ীটা কার ভাই?'

হঠাৎ যেন কণ্ঠস্বরে চিনতে পারলে দোকানদারের ছোকরা চাকরটা। কাছে এসে ঠাওর করে চেয়ে বললে, 'কে, অজয়দা?'

এবার অজয়ও চিনতে পারলে। তারই বাল্যবন্ধু শশাঙ্কর ভাই মৃগু বা মৃগাঙ্ক। জাতে ওরা কলু—তবে চায়ের দোকানে চাকরী করবার মত অবস্থা ওদের কখনই ছিল না। বিস্মিত হ'ল সে—কিন্তু প্রশ্ন করলে না। যে দিন চলে গেছে তারপর আর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাই মূর্খতা। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে অজয় সহজকণ্ঠেই বললে, 'তোর দাদা?'

'মারা গেছে।' মৃগাঙ্কর চোখ ছল্ ছল্ করে উঠল। সে-ও আর কোন

কথা বললে না। কিসে মারা গেছে, এসব প্রশ্ন যে অনাবশ্যক তা ঐ ছেলেটাও জানে।

খানিকটা পরে মৃণ্ড বললে, 'বাড়ীটা কার জিগ্যেস্ করছিলেন না? ও একজন পাঞ্জাবীর। ঐ যে ওখানে বড় এরোড্রোম হয়েছে, তাইতে সব কনট্র্যাক্ট্ নিয়ে বিস্তর পয়সা করেছে ও। জায়গাটা নাকি ওর খুব পছন্দ, তাই এখানেই বাড়ী করলে। ওরা সবাই থাকে এখানে—।'

সংবাদটা এতই স্বাভাবিক এবং সাধারণ যে এ-সম্বন্ধে আর কোন আলোচনাই চলে না। অজয়ের সেদিকে মনও ছিল না। চায়ের খালি কাপটা অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে হঠাৎ এক সময়ে মরিয়া হয়ে অজয় প্রশ্ন করে ফেললে, 'আমাদের বাড়ীর খবর কিছু জানো নাকি মৃণ্ড!'

প্রস্তুত আছেই ত চরম দুঃসংবাদের জন্য। তবু বুক একটু কাঁপে বৈকি!

মৃণ্ড সহজ-কণ্ঠেই বললে, 'আপনি কি ওদের খবর পাননি? ভালই আছে শুনেছি।'

ভালই আছে! বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে মুখের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে একটু সময় লাগল অজয়ের। ভালই আছে কি করে? একি সম্ভব? ছেলেটা হয়ত খবরই রাখে না, আন্দাজে বলে দিলে কথাটা। এ সময়ে সকলেই নিজেদের দুর্ভাগ্যে কিংবা সৌভাগ্যে ব্যস্ত—কারুরই জীবন-যাত্রা সহজ ও স্বাভাবিক নয়, এখন প্রতিবেশীর খবর জানতে চাওয়াই ভুল।

নতুন করে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হ'ল না অজয়ের। সে পয়সা দিয়ে উঠে পড়ল। মৃণ্ড ওর সঙ্গে খানিকটা বেরিয়ে এসে কী যেন বলতে গেল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বলতে পারলে না—ফিরে গেল। হয়ত সে তার নিজের পারিবারিক সংবাদই কিছু দিতে চেয়েছিল, কে জানে!…

এগিয়ে যেতে যেতে দু'একজন পরিচিত লোকের সঙ্গেই দেখা হ'ল। আলতাফ আলি আর চন্দ্র জানা, কতকগুলি কণ্ট্রোলের দোকান পেয়েছে—বেশ

চাকচিক্য ওদের। তবে যাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্টতা ছিল তাদের অনেক লোকই নেই। কেউ মরেছে, কেউ দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামছাড়া হয়েছে, কেউ বা যুদ্ধে চাকরী নিয়েছে। দু'চারজন তখনও জেলে।

কিন্তু যাদের খবরের জন্য মন ওর একাগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করছিল, তাদের খবর কেউ দিলে না। সবাই বোধ হয় ধরে নিয়েছে যে ওর বাড়ীর খবর ও জানেই। চন্দ্র জানাই শুধু শেষ পর্য্যন্ত প্রশ্ন করলে, 'বাড়ীর খবর-টবর পেতে ওখানে ত?'

'না না!...ওরা বেঁচে আছে কি?' মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলে অজয়।

'বিলক্ষণ! বেঁচে থাকবে না কেন। সবাই বেঁচে আছে!'

'কী করে বাঁচল চন্দ্র কাকা। কিছুই ত ছিল না!'

'তা বটে।' চন্দ্র ম্লান হাসি হাসলেন। 'যা দিন গেল। কে কার খবর নেয় তার ঠিক নেই। ঝড়ে অবশ্য আমাদের এ অঞ্চলটার বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি কিন্তু দুর্ভিক্ষে শেষ করে দিয়ে গেছে।......তবু তোমাকে ত সবাই স্নেহ করত—কেউ কেউ দেখাশুনো করেছেন বৈকি! বিশেষ বৌমা আমার খুব শক্ত মেয়ে। তিনি যে কোথা থেকে কোথা থেকে কি জোগাড় করেছেন তা আমরা সব জানিও না। তবে ঐ পাঞ্জাবী কন্‌ট্রাক্‌টরটা—ও খুব করেছে তোমাদের।'

'পাঞ্জাবী কন্‌ট্রাক্‌টরটা?......কিন্তু ওর সঙ্গে ত আমাদের কোন পরিচয়ই ছিল না কাকা!'

'মানুষটা বাবা খুব ভাল। এমনি পরোপকারী ত আছেই, তাছাড়া তোমার মাকে ও মা বলেছে কিনা। বৌমা ওর স্ত্রীকে ধরেছিলেন কিছু সাহায্যের জন্য, সেই সূত্রেই আলাপ হয়। ও আবার বৌমার কাছে বাংলা শিখছে। মাইনের নাম করেই ও কিছু কিছু দেয়—

সব কথা অজয়ের কানেও গেল না। সংবাদটা একেবারে উদ্‌ভ্রান্তকর, অবিশ্বাস্য। জেলে বসে বসে ও যত কথাই কল্পনা করুক না কেন—এ ছিল ওর

সুদূর স্বপ্নেরও বাইরে। মিনতি, মিনু—সত্যিই তাহলে অসম্ভব সম্ভব করেছে। বাঁচিয়ে রেখেছে শুধু ওর মাকে নয়—সবাইকেই।

অজয় এবার দ্রুত বাড়ীর পথ ধরলে। এতক্ষণ যেটা ছিল আশঙ্কা এবার সেটা হয়েছে আশা। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আশা—তার মধ্যে কোথাও কোন সংশয়, কোন ভয় নেই। সত্যিই-ত, মিনু যা মেয়ে, সে যে কিছু পারবে না এমন সন্দেহ করাই ত মূর্খতা!……

বাড়ীর দোরের কাছে আসতেই যার সঙ্গে ওর দেখা হ'ল সে ওর মেয়ে 'খুকী'—ঠিক চিন্‌তে না পেরে সভয়ে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেল। ভাগ্নী রমা কিন্তু ভুল করেনি—প্রণাম ক'রে উঠে কেঁদে ফেললে! রমা বেশ বড় হয়ে উঠেছে—। ওদের গায়ে কোন আভরণ নেই, খুব মোটা একখানা শাড়ী পরে আছে, তবে তা খুব ছেঁড়া নয়। অর্থাৎ অভাব আছে, দৈন্য নেই।

'মা কোথায় রে, রমা?'

'ঐ যে—'

রমা ছুটে গিয়ে সংবাদটা দিল দিদিমাকে। মা চোখে আর একেবারেই দেখতে পান না। বোধ হয় অবিরল কেঁদে কেঁদেই দৃষ্টিটা একেবারে গেছে। রমার মুখে খবরটা পেয়ে প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করতে পারলেন না। তারপর উঠে ওকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে কেঁদে-কেটে অস্থির। পাগলের মত কী যে বলতে লাগলেন তা কেউই বুঝল না। এ সবই অজয় জানত……বিচলিত সেও হ'ল, তবে নিশ্চিন্ত হবার আনন্দটাই তার বেশী।

কিন্তু মিনু কৈ?

সবচেয়ে প্রয়োজন যে তাকেই—অন্তরের সমস্ত কৃতজ্ঞতা ও প্রেম তার পায়ে উজাড় হয়ে পড়বার প্রতীক্ষা করছে!

মা-ই একটু শান্ত হয়ে ডাকলেন 'বৌমা !'

অজয়ের তৃষিত দৃষ্টি দ্বারপথে একাগ্র হয়ে চেয়ে রইল ! একটু পরেই মিনু বেরিয়ে এল। সামান্য একটু ঘোমটা কপাল পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল নয়, বরং কেমন যেন একটা কঠিন ঔদাসীন্য, একটা শান্ত নির্লিপ্ততা মাখানো......মাটির দিকে চোখ রেখেই এসে শুধু নীরবে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। মায়ের সামনে সে কোনদিনই কথা কয় না, কিন্তু চোখেও তার কোন সম্ভাষণ, কোন অভ্যর্থনা ফুটে উঠল না।

একটু পরে সে ভেতর থেকে মুখ-হাত ধোবার জল এনে দিলে, আর একটা গামছা। পিতলের গাড়ুটাও বোধ হয় নেই—জল এল মাটির পাত্রে। কিন্তু সেদিকে অজয়ের নজর ছিল না—যার চোখের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তার চোখ ব্যস্ত, সে একবারও মাথা তুললে না, কথা কইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করলে না।

অজয় বুঝতে পারলে না এ কী ! এ কী অভিমান ? এমনি করে সব ভার ওর ওপর চাপিয়ে অজয় চলে গিয়েছিল তারই জন্য অভিমান ? কিন্তু মিনতি ত জানে যে তাতে অজয়ের কোন অপরাধ ছিল না। ঘটনাটা একেবারেই আকস্মিক। তা ছাড়া, সে যখন সত্যি সত্যিই সংসার ফেলে ঐ সব করে বেড়িয়েছে—তখনও ত কোনদিন কোন অনুযোগ করেনি মিনু, বরং সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক প্রশ্ন থেকে তাকে আড়াল করেই রাখত সে। তবে ?

মা অনর্গল বকে যেতে লাগলেন। তাঁর পাঞ্জাবী ছেলেটিকে কেমন করে হঠাৎ পাওয়া গেল—সে কত উপকার করেছে, ইত্যাদি ! এসব যে তাঁর বৌমার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে, বৌমার চেষ্টা ও উপস্থিত বুদ্ধিতেই যে এতগুলি জীবন বেঁচেছে, তাও বললেন বার বার। তবে সে ছেলে তাঁর যতই দিতে চাক্—বৌমা যে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন জিনিষই তার কাছ থেকে নেয় না এবং কাউকে নিতে দেয় না—তার জন্যে সে বেচারা কত দুঃখ করে—এমন অনুযোগের সুরও তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পেলে।

মা যে এত দুঃখে আত্মসম্মান-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন এবং তাঁর মনের মধ্যে লোভের চেহারা ফুটে উঠেছে তাতে আশ্চর্য্য হ'ল না অজয়, এটাই স্বাভাবিক। বরং স্ত্রী যে এখনও সেই সম্মান-জ্ঞানটুকু বজায় রেখেছে তাতেই সে আবার নতুন করে শ্রদ্ধা বোধ করল তার সম্বন্ধে। শ্রদ্ধা আর বিস্ময়, দুই-ই!

কিন্তু মিনু কেন তার কাছে আসছে না কিছুতেই? রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত আছে বটে, মায়ের সেবা, তার জলখাবার, সকলের আহার্য্য প্রস্তুত—এ সবই দরকার সন্দেহ নেই, কি তাই বলে একবার তার কাছে আসতে পারত না সে? কেন তার এ ঔদাসীন্য? শুধু তাই নয়—তার ব্যবহারে এমন একটা কঠিন শৈত্য ফুটে উঠেছে যে, অজয়ও সাহস পাচ্ছে না নিজে থেকে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে···

জলযোগ শেষ করে অজয় বাইরের মাঠে গিয়ে বসল। রীতিমত শীত পড়েনি এখনও, তবু শাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদটুকু ভালই লাগে।···

ও বসে বসে সেই কথাই ভাবতে লাগল। কেন? কেন ওর এই অভিমান? কী যে অপরাধ ওর ঘট্‌তে পারে কিছুতেই ভেবে পেলেনা। জেল থেকে চিঠি দেয়নি তাই? কিন্তু মিনুর বোঝা উচিত সে কেন দেয়নি চিঠি—কী সুগভীর লজ্জা ও বেদনায় ও তাদের খবর নেয়নি। এর আগেও সে যতবার জেলে গেছে, বাড়ীতে চিঠি দেয়নি একবারও। অপরকে পড়িয়ে তবে চিঠি পাঠাতে হবে—এ অপমান ওর বড় বেশী লাগত। সুতরাং নতুন করে অপরাধ নেবারও কিছু নেই। তবে?···

এ 'তবে'র উত্তর কোথাও মিলল না। বেলা বাড়তে লাগল ক্রমশ, শূন্য মাঠের বাতাস রৌদ্র-তপ্ত হয়ে উঠল। দূর-দূরবর্ত্তী শাল গাছের পল্লবের দিকে চেয়ে চেয়ে এ সমস্যার কোন সমাধানই করতে পারলে না অজয়। কয়েক

ঘণ্টা আগে-পর্য্যন্ত যে আশঙ্কায় ওর মন ভারী হয়ে ছিল, সে শঙ্কার কারণ আর নেই ; কিন্তু তার সঙ্গে ওর সব চেয়ে যেটা বড় আশা অন্তরের, সেটাও এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে তা সে একবারও ভাবেনি। মিনু যদি বেঁচে থাকে ত সে মিনু ওরই থাকবে—একান্ত ভাবেই ওর—এইটুকুই সে ভেবেছে এতকাল, কিন্তু এ কী অভাবিত দূরত্ব রচিত হ'ল ওদের মধ্যে ! এ কী অকারণ অথচ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ! কেমন করে এ বাধা পার হবে ও, কেমন করে আবার প্রসন্ন দৃষ্টি ফুটে উঠবে মিনতির চোখে, সে উপায় ও ভাবতেই পারে না—কেন সে প্রসন্নতা চলে গেল এই ভেবেই যে বিহ্বল হয়ে পড়েছে !

আরও বহুক্ষণ বসে থেকে অজয় নিজেকে সামলে নিলে। কারণ যাই হোক—মিনতির অভিমান নিয়ে ওর অন্তত অভিমান-বোধ করবার অধিকার নেই। তার যেটা কঠিনতম কর্ত্তব্য ছিল, সর্ব্ববৃহৎ দায়িত্ব ছিল, তা মিনুই বহন করেছে তার হয়ে, তাকে লজ্জা ও দুঃখ থেকে বাঁচিয়েছে সে—সুতরাং আজ সে-ঋণ শোধ করবার জন্য যত দৈন্যই স্বীকার করতে হোক্, করবে। সে-ই তপস্যা করবে মিনতির প্রসন্নতার জন্য।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে অজয় নিজেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করে উঠে পড়ল। মিনতির বোধ বোধ হয় এতক্ষণ রান্না শেষ হয়ে গিয়েছে—এবার বাড়া ফেরাও দরকার। আর কীই বা হাতিঘোড়া রাঁধবার আছে ওর, মা ত বলেই দিয়েছেন, একেবারে দেহ রক্ষা করবার জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী ভিক্ষা সে নেয় না।

'ভিক্ষা' শব্দটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অজয়ের আত্মা যেন শিউরে উঠল। পরক্ষণেই একটু হেসে সে বাড়ীর পথ ধরলে। নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি করে লাভ কি ? ভিক্ষাই-ত ! মায়ের মুখে যেটুকু শুন্‌লে তাতে এটা বুঝতে বাকা থাকে না যে, পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি ওদের সাহায্যই করেন নিয়মিত। আর সে সাহায্য মিনতিই তাঁর কাছে চেয়ে নিয়েছে একদিন। সত্যি, কী

না করেছে তার জন্য মিনু—কী অসম্ভবই সম্ভব করেছে। ভিক্ষা শুধু চাইলেই এতদিন ধরে এমন ভাবে ভিক্ষা পাওয়া যায় না—কৌশলে আদায় করতে হয়। এতবড় দাতা কেউ নেই যে এতদিন ধরে নিয়মিত ভাবে একটি পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করবে। বিশেষ মায়ের কথার ফাঁকে ফাঁকে সে লোকটির যে পরিচয় পেয়েছে অজয়, তাতে এটুকু বুঝতে পেরেছে যে সে অন্তত সে রকম দাতা নয়।···কী করে এমন অঘটন ঘটালে মিনু কে জানে!···

বাড়ীর বাইরে এসে অজয় থম্‌কে দাঁড়াল। ওদের বাইরের নিম গাছটাতে কী একটা সুন্দর পাখী বাসা করেছে। একটা নয়—এক জোড়া। মাদী পাখীটা বাসায় বসে বোধ হয় ডিমে 'তা' দিচ্ছিল, এতক্ষণ তাকেই দেখেছে অজয় দূর থেকে। এখন মদ্দাটাও কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ করে ফিরে এল। খাবার বাচ্চাদের জন্য পক্ষীমাতারা সংগ্রহ করে এ দৃশ্য সে অনেক বার দেখেছে কিন্তু আজকের এ ব্যাপার একটু অভিনব। মদ্দা পাখীটা, বোধ হয় গিন্নীর জন্যই—ঠোঁটের খাবার ওর সামনে নামিয়ে রেখে আবার উড়ে চলে গেল। আর গিন্নী পাখীটা অনায়াসে সেই খাবার খেতে লাগল বসে বসে—

আপন মনেই হেসে উঠ্‌ল অজয়। প্রেম তাহ'লে এদের মধ্যেও আছে! আশ্চর্য্য!

মিনু এসে তেলের বাটি রেখে গেল ওর সামনে, আর গামছা। সেখানে কেউ নেই তখন, তবু মিনু কথা কইবার চেষ্টা করলে না। অজয় আর থাকতে না পেরে ডাকল, 'মিনু, শোন।'

যেন চম্‌কে উঠল মিনু। মুখ তুলে চাইল বটে কিন্তু সে দৃষ্টিতে আনন্দ নেই—আশা নেই। শঙ্কিতা হরিণীর মতই ভীত, আর্ত্ত তার চাহনি। এইবার

প্রথম বুঝতে পারল অজয়, এতক্ষণ যাকে সে নিস্পৃহতা, ঔদাসীন্য বলে মনে করেছিল তা আসলে হয়ত অপরিসীম ভয়। সেই আশঙ্কা দমনের প্রাণপণ চেষ্টাই তার মুখকে অমন কঠিন করে তুলেছিল।

ফিরে চাইলে, চোখে চোখ পড়ল তবু মিনু দাঁড়াল না। এক রকম ছুটেই পালিয়ে গেল!

তেল মেখে স্নান করতে যেতে যেতে সেই কথাই ওর মনে হতে লাগল। এ আবার যেন নতুন সমস্যা! কিসের ভয় তাকে? ভয় যে সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই ওর মনে, ভয়ের এ স্পষ্ট চেহারাটা সে চেনে। মিনু ত ওর কাছে কোন অপরাধ করেনি, তবে ভয় কিসের!

যেতে যেতে অন্যমনস্ক ভাবেই একবার পাখীর বাসাটার দিকে চাইলে

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, রৌদ্র যেন ঠিকরে পড়ছে। একেবারে স্নানের ঘাটে গিয়ে জলে পা ডুবিয়ে বসল, আঃ! কী শান্তি!

কিন্তু দেহ ঠাণ্ডা হ'লেও মন শান্ত হয় না কিছুতে। একটা অস্বস্তি কাঁটার মত খচ খচ করে। কত কি চিন্তা, কত সম্ভাবনা খানিকটা করে মনে আসে আবার একটা সম্ভাবনার তলায় তা চাপা পড়ে যায়।

এমনি ক'রে কতক্ষণ সে বসেছিল তা মনে নেই। হঠাৎ এক সময়ে ওর চমক ভাঙ্গল ভাগ্নীর কণ্ঠস্বরে, 'মামা তুমি চান করতে নামোনি এখনও—সবাই আমরা বসে আছি যে! দিদিমা হয়ত একটু পরেই কান্নাকাটি শুরু ক'রে দেবে।'

তা বটে! কথাটা ওর মনেই ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়ে উঠল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁরে, মায়ের এখনও সেটা আছে?'

'নেই আবার! ও বছর দুর্ভিক্ষের সময় যখন এক-একদিন মামীমা কিছুতেই কিছু যোগাড় করতে পারত না তখন উপোষেই কাটত ত! আমরা ছেলেমানুষ

হয়েও চুপ ক'রে থাকতুম কিন্তু দিদিমা কেঁদেকেটে মামীমাকে গাল দিয়ে অনর্থ করত। সেইজন্তেই ত মামীমা শেষ পর্য্যন্ত ঐ লাখপৎ মামার কাছে গেল সাহায্য চাইতে। নইলে, লাখপৎ মামা ওর ঢের আগেই নাকি আমাদের চাল-ডাল কাপড় পাঠাতে চেয়েছিল তখন মামীমা কিছুতে রাজী হয়নি, আমাদের বলেছিল ওতে তোমার মামার অপমান করা হবে মা! কিন্তু কী করবে, দিদিমা যখন একদিন রাগ ক'রে চৌকাঠে মাথা খুঁড়ে রক্তারক্তি করে ফেললে, তখন মামীমা আর থাকতে পারলে না, সেইদণ্ডেই দুপুর রোদ মাথায় ক'রে ওদের বাড়ী চলে গেল—'

রমা আরও কত কি বকে যেতে লাগল কিন্তু সে দিকে আর অজয়ের কান ছিল না। সে ভাবছিল মিনতির কথা। কত কীই না সহ্য করতে হয়েছে বেচারীকে! না ছিল সেদিন কোথাও একটু সহানুভূতি, না ছিল কোন অবলম্বন! তবে একটা কথা সে অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারলে না যে আগেও যা ক'রে মিনু অন্ন সংস্থান করছিল তাও-ত ভিক্ষাই, তবে লাখপৎ রায়ের সাহায্য ফিরিয়ে দিয়েছিল কেন?

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে তখন। বেশী চিন্তা করার সময়ও ছিল না। সে তাড়াতাড়ি মাথা মুছে উঠে পড়ল। বাড়ী যেতে যেতে রমা পাশের নিমগাছ-তলাটা দেখিয়ে বললে, 'দুর্ভিক্ষের সময় ঐ গাছতলায় যে কত লোক মরে পড়ে থাকত তার ইয়ত্তা নেই। বোধ হয় পুকুরে জল আছে আর গাছের ছায়া আছে এই লোভেই আসত। কিন্তু মামা সে কী কষ্ট, সে যে মানুষের চেহারা তা বোঝা যেত না। এক-একদিন থাকতে না পেরে নিজেদের পাতের ভাত এনে ওদের খাওয়াবার চেষ্টা করেছে মামীমা, কিন্তু তারা খেতেও পারত না—অনেকে খাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেই ভাতের মধ্যেই মুখ গুঁজে মরেছে!'

ছবিগুলো ওর চোখের সামনে দিয়ে যেন সরে সরে যেতে লাগল। অভুক্ত

অসুস্থ অজয় শিউরে উঠতে লাগল বার বার। মানুষের জীবনের মূল্য কত কম তা এই দুর্ভিক্ষই শিখিয়ে দিয়ে গেল ওদের।

বাড়ীর সীমানায় পা দিয়েই রমা চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে লাখপৎ মামা আমাদের বাড়ী ঢুকছে—'

সেখান থেকে একটি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ভদ্রলোকের পিছনটাই দেখা গেল শুধু—সেও এক মুহূর্ত্তের জন্য।

অজয় জোরে জোরে পা হাঁকাল। যে তাদের এত উপকার করেছে—মৌখিক শিষ্টাচারে অন্তত তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন বৈকি!

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে পা দিয়ে সে কাউকেই দেখতে পেলে না। মিনতি নত-মুখে কী একটা কাজ করছে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। মা ওধারের ঘরের মধ্যে। অজয় বিস্মিত হয়ে এদিক ওদিক চাইছে, রমা প্রশ্নটা করেই ফেললে, 'লাখপৎ মামা এসেছিল না?'

মাথা না তুলেই মিনতি উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ।'

'কৈ দেখছি না ত।'

'চ'লে গেছেন।' সংক্ষিপ্ত এই উত্তরটি দিয়ে মিনতি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

এই রৌদ্রে এতটা পথ এসে কেনই বা তিনি এমন অকস্মাৎ চলে গেলেন তার কোন কারণই খুঁজে পেলেনা অজয়। বিশেষ করে গেলেনই বা কোথা দিয়ে? সোজা পথেই ত সে এসেছে। হয়ত পিছনের দরজা দিয়ে বাগানের পথে বেরিয়ে গেছেন।

কিন্তু কেন?···

এই 'কেন'টাই ওর মাথায় ঘুরে বেড়ায় অনেকক্ষণ ধরে। আহারাদির পর শ্রান্ত দেহ ঘুমে শিথিল হয়ে আসারই কথা, কিন্তু অজয়ের চোখে তন্দ্রা এল না। মিনতির ব্যবহারে যে একটা কঠিন ঔদাসীন্য, একটা দূরত্ববোধ ফুটে

উঠছে—তারও যেমন কোন কারণ খুঁজে পায়না অজয়, তেমনি ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের ব্যাপারটাও দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয়। শুধু একটা অস্পষ্ট দুশ্চিন্তা ওর মনকে পীড়িত করতে থাকে—

শেষ পর্য্যন্ত সন্ধ্যার কিছু আগে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরোচ্ছে দেখে মা প্রশ্ন করলেন, 'কোথা যাবি?'

অন্যমনস্ক ভাবেই অজয় উত্তর দিলে, 'তোমার ঐ নতুন ছেলেটির সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি। ও-বেলা কেন ভদ্রলোক অমন করে হঠাৎ চলে গেলেন তারও একটু খোঁজ নেওয়া দরকার ত! তাছাড়া কৃতজ্ঞতাটা আমারই জানাতে যাওয়া উচিত!'

মা আর কোন কথা কইলেন না কিন্তু সে যখন বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে প্রায় রাস্তায় পড়েছে হঠাৎ পেছন থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে রমা বললে 'মামীমা তোমাকে ডাকছে একবার, এখুনি—'

মামীমা ডাকছে!

তাহ'লে কি মিনুর কথা কইবার অবসর হ'ল এতক্ষণে? বিস্মিত অজয় ঘরে ঢুকে দেখলে মিনু স্তব্ধ হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, ও পাশের জানলাটার দিকে চেয়ে।

কাছে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে অজয়, 'আমাকে ডাকছিলে মিনু?

'তুমি—তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির বাড়ী—একটু আলাপ ক'রে আসা উচিত নয় কি?'

'না—তুমি ওখানে যেওনা।'

'কেন বলো ত।'

'না, কোন মতেই ওর সঙ্গে দেখা করা হবে না তোমার!' সহসা যেন মীনু উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল, 'ওর মুখ দেখলে মহাপাপ হয়—ও, ও তোমার সামনা-সামনি দাঁড়াবার উপযুক্ত নয়!'

আরও বিস্মিত হয়ে অজয় বললে, 'কী ব্যাপার বলো ত? হয়ত ভদ্রলোক অসাধু উপায়ে কিছু টাকা করেছেন কিন্তু—উনি যে আমাদের এত উপকার করলেন সেটা ভুলে যাওয়া কি সম্ভব? আমাদের অন্তত উচিত নয় ওঁর বিচার করতে যাওয়া।'

মীনু কী যেন একটা মানসিক উত্তেজনায় থর থর ক'রে কাঁপছিল, ওর কণ্ঠ ভেদ করে একটা আর্ত্তনাদ বেরোল, 'ওগো তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না? আমি, আমি যে আর পারি না এ যন্ত্রণা সহ্য করতে!'

অকস্মাৎ একবার অজয়ের চোখের সামনে সেই পাখীর বাসাটা ভেসে উঠল। একটা অস্ফুট অথচ মর্ম্মান্তিক সংশয় নিমেষের মধ্যে ওর আত্মাকে যেন পীড়িত, মথিত করে চলে গেল। ডুবন্ত মানুষ প্রথমবার জল খেয়ে যেমন হাঁপিয়ে উঠে, তেমনি ভাবে ও ছট্‌ফট্‌ করে উঠল নিঃশ্বাস নেবার জন্য।

সেই সঙ্গেই ম্লান আলোতে ঘরের দেওয়ালগুলোর মধ্যেকার জমাটবাঁধা অন্ধকার যেন ওকে পিষে ফেলতে লাগল। একবার আকুল ভাবে কি একটা যেন প্রশ্ন করবার চেষ্টা করলে ও, তার পরই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অন্ধকারের মধ্যেই শালবনে ও যে কতক্ষণ পাগলের মত ঘুরে বেড়াল, তা ও নিজেই জানে না। এমন কি, ঠিক কী যে ও ভাবছে তাও বোধ হয় তখন বলতে পারত না। শুধু কিছুতেই যে ও তখন স্থির হয়ে থাকতে পারছে না—এইটুকুই অনুভব করছিল।

মিনু? মিনু শেষে এই করল!

রাগ—কিংবা অভিমান কিংবা ধিক্কারবোধ্ তা ঠিক করে বলা শক্ত—হয়ত শুধুই একটা গ্লানি ওর কণ্ঠ পর্য্যন্ত উপছে পড়ছিল। আর একটা অসহায় ভাব। কী করবে ও, কী করলে এর প্রায়শ্চিত্ত হয়!

কি দরকার ছিল মিনুর এমন করে বাঁচিয়ে রাখবার আর বেঁচে থাকবার। না হয় সবাই যেতো, যেমন করে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে তেমনি করেই। ধিক্—ধিক্ ওকে!

কিন্তু সন্ধ্যা যখন রাত্রিতে ঢলে পড়ল, আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের নীচে সীমাহীন বিশাল প্রান্তর ক্রমে নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন হয়ে এল—তখন ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্কও একটু করে ঠাণ্ডা হতে লাগল। অজয় নিজেই ত বলে গিয়েছিল মিনুকে—'যেমন ক'রে হোক্ মাকে বাঁচিয়ে রেখো!' ওর বুড়ো অসহায় মা, ক্ষিদে পেলে আজও কাঁদেন ছেলেমানুষের মত, মাথা ঠোকেন। তিনি কি পারতেন অমনি করে মরতে, ঐ যারা দলে দলে নিঃশব্দে মরেছে ওদেরই পুকুরপাড়ের গাছতলায়? না, সে চিন্তাও অসহ্য! আর ওর ঐ ক্ষীরের পুতুলের মত মেয়ে, ওর মাতৃহারা ভাগ্নী!

কর্ত্তব্য ত তারই, বিবাহের মন্ত্র পড়ে সেই ত স্ত্রীর চিরকালের মত ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছিল—কোন্ অধিকারে সে দেশের কাজ করতে নামে তাদের কোন ব্যবস্থা না করেই? সে জেলে গিয়েছিল, সেইটেই যথেষ্ট ত্যাগ-স্বীকার মনে ক'রে দেশবাসীর কাছ থেকে হাততালি ও বাহবা আশা করে। কিন্তু যারা সামনে এগিয়ে আসেনি, কোনদিক থেকেই যাদের ঐ বাহবা পাওয়ার আশা নেই, তারা কি কম ত্যাগ স্বীকার করেছে বা করছে ওদের চেয়ে?

বেচারী মিনু—যে ওকে একদিনের জন্যও অশান্তি ভোগ করতে দেয়নি, একদিনও ওর কাজে বাধা দেয়নি—ওর গর্ব্ব, ওর আত্মার আনন্দ মীনু—সে যে নিঃশব্দে কত বড় আত্মত্যাগ করল, স্বার্থপর পুরুষের মন ওর, সে কথা কি

ও একবারও ভেবে দেখেছে ? তিলে তিলে কী যন্ত্রণা সহ্য করেছে সে—সে কি ওদের চেয়ে কম কষ্ট পেয়েছে ! ওর এতবড় ত্যাগ স্বীকার, এতবড় দুঃখবরণের ঋণ কোনও মূল্যেই যে শোধ হওয়া সম্ভব নয় !

তবে ?

ওরা একবার জেলে তিনদিনের জন্য অনশন ধর্ম্মঘট করেছিল—সে কথা ওর আজও মনে আছে। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গিয়েছিল ও বলতে গেলে। সেইদিনই ওর মনে হয়েছিল, মান-সম্ভ্রম-লজ্জা সবই জীবনকে কেন্দ্র করে, মানুষ যখন মৃত্যুর সামনা-সামনি দাঁড়ায়, তখন এসবের কোন মূল্যই আর থাকে না। মীনুকে বিচার করতে বসেছে সে ? আশ্চর্য্য, সে ত তপস্যা করেছে ওর আজ্ঞা পালন করবার জন্য—ওদের কোনমতে শুধু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয় করেছে সে একটু একটু ক'রে, প্রতিদিন সে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা সহ্য করেছে।…

অনেকক্ষণ এমনিভাবে ঘুরে বেড়াবার পর গভীর রাত্রে অপরাধীর মত নতমস্তকে অজয় বাড়ী ফিরল। তখন সকলেই খেয়ে শুয়ে পড়েছে, শুধু মিনতি একা বসে আছে রান্নাঘরের দাওয়ায়, পাথরের মত কঠিন হয়ে।

আস্তে আস্তে ও কাছে গিয়ে ডাকল, 'মিনু !'

বোধ হয় মিনু একবার শিউরে উঠল, কিন্তু কোন উত্তর দিলে না।

ওর পাশে বসে পড়ে ভগ্ন-কণ্ঠে অজয় আবার ডাকলে, 'মিনু, অপরাধ আমার অনেক বড় কিন্তু তুমি ত আমার অনেক অন্যায় মাপ করেছো, এবারেও ক'রে নাও।'

বৈরাগীর বাসা

কলকাতা শহরের এত কাছে এরকম জঙ্গল আছে, বিশ্বাস করা শক্ত বৈ কি! কীই-বা দূর, ট্রেণে আট মাইলেরও কম, বাসে গেলে বোধ হয় পুরো আট মাইলই দাঁড়ায়। হাজারেরও বেশী লোক প্রত্যহ এই স্টেশন থেকে মাসিক টিকিটে যাতায়াত করে, কলকাতার ছোঁয়াচ এর সর্ব্বাঙ্গে। তবু এখানকার রাস্তা পাকা হয় না, বর্ষায় হাঁটু পর্য্যন্ত পাঁকে ডুবে যায়। পথে আলো ত জ্বলেই না, ঈশ্বরদত্ত যেটুকু আলো আসতে পারত, সেটুকুও আড়াল করে রাখে অসংখ্য বাঁশঝাড় আর ঘন আগাছার জঙ্গল। পানীয় জলের জন্য এখনও অধিকাংশ লোককে পচাপুকুরের মুখ চেয়ে থাকতে হয় —ফলে ম্যালেরিয়া এবং পেটের অসুখে সবাই মুমূর্ষু। এদের চেহারা আর স্বভাবের মধ্যে কোথাও প্রাণ-শক্তির চিহ্নমাত্র নেই।

তবু এদের দেবদ্বিজে যে ভক্তির অভাব নেই—এটা মানতেই হবে। এর যদি কেউ প্রমাণ চান তাহ'লে আমাদের সাধুজীর কথাই বলব। সেই কবে উনিশ শ সাতাশ সালে গঙ্গাসাগর মেলার ফেরৎ এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আর তাঁকে কোথাও যেতে হয়নি। স্থানটি যে তাঁর এত পছন্দ হয়েছিল তার মূলে এই কারণটাই বোধহয় বড় ছিল যে, ঈশ্বর আরাধনার যেটা প্রধান অঙ্গ, নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত আহার—সেটার অভাব এখানে কোনদিনই হবে না।

আর তা হয়ওনি। বরং একটু একটু করে অন্য ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল তাঁর। সরস্বতীর শীর্ণ খালের ধারে নির্জন শ্মশানপ্রান্তে তাঁর একটু কুটীর উঠল, কুটীরের সামনে জমিতে বেড়া দেওয়া হল, এমন কি ক্রমে ক্রমে তাতে

লাউ কুমড়োর মাচাও দেখা গেল। সাধুজী সুখেই ছিলেন। বারো মাসে তের পার্ব্বন—সিধে ও নিমন্ত্রণ ত লেগেই আছে। তিনি কোন গৃহস্থ বাড়ীতে খেতে যেতেন না, গৃহস্থরাই লুচি-তরকারী বা অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়ে যেত। রেঁধে খেতে হত তাঁকে দৈবাৎ। রাত্রে প্রত্যহই কুণ্ডুবাবুদের ঠাকুর বাড়ী থেকে শীতলের প্রসাদ আসত। সুতরাং জীবনধারণের চিন্তা অন্ততঃ তাঁর ছিল না এখানে কোনদিনই। আরামে ও আলস্যে, ভগবানের নাম করে, গ্রামবাসীকে প্রয়োজনমত দুটো গাছ-গাছড়ার ওষুধ দিয়ে, কখনও বা কোথাও দু-চার দিনের জন্য ভাগবত ও চণ্ডী পাঠের কাজ নিয়ে তাঁর দিন কেটে যাচ্ছিল। এখানে দু'চার ঘর তাঁর গৃহস্থ মন্ত্রশিষ্য ছিল, কাজেই সন্ন্যাসী শিষ্য না থাকলেও অসুখ-বিসুখে সেবা-শুশ্রূষারও ভাবনা ছিল না। অর্থাৎ এতদিন ত কাটলই—জীবনের বাকী দিন ক-টাও তাঁর এইখানেই কাটবে এই কথা সবাই জানত—এমন কি তিনি নিজেও।

কিন্তু হঠাৎ তাঁর এই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার মধ্যে বাইরের একটা ঝটকা হাওয়া এসে লাগল একদিন, তার ফলে এতদিনের বাসার মূল অবধি উঠল কেঁপে।

ব্যাপারটা কিছুই না, সাধুজী নিজেও যেমন করে ভাসতে ভাসতে একদিন এখানে এসে ঠেকেছিলেন, তেমনি করেই আর একটি বৈষ্ণব বাবাজী এসে পৌছলেন। বাবাজী একা নন্—তাঁর সঙ্গে তাঁর মাতাজীও, অর্থাৎ গৃহিণী-শিষ্যা-সেবাদাসীর একটা অপূর্ব্ব সম্মেলন। বাবাজীর কাঁধে কাঁথা, বগলে ঝুলি আর মাতাজীর কোমরে পুঁটুলি—এই অবস্থায় একদিন গঙ্গাসাগরের ফেরৎ এসে বেড়ার আগড় ঠেলে সাধুবাবার উঠোনে ঢুকলেন, বেশ প্রশান্তমুখেই বললেন, 'রাধে রাধে—সাধুবাবা, দণ্ডবৎ হই।'

বলা-বাহুল্য সাধুজীর ললাটে একটা বড় রকমের ভ্রুকুটি দেখা গেল। কিন্তু তবু তিনি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে বললেন, 'নারায়ণ, নারায়ণ। আপনারা কোথা থেকে আসছেন বাবাজী মশাই?'

'আজ্ঞে গিয়েছিলাম গঙ্গাসাগর। থাকি বাবা অনেক দূরে—শ্রীধাম বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রয় পেয়েছি একটুখানি, সেখানেই থাকি। আসা আর হয় না—তবু বলি, সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার, একবারও অন্ততঃ ডুবে আসি চল্। মাগী বলে রেলের ভাড়া পাবো কোথায়? আমি বলি রেলে কী হবে, তীর্থে যাবো হেঁটে। এখানেও ত মাধুকরী করেই খেতে হয়—না হয় তাই করতে করতেই চলে যাবো। তা বাবা, মিছে কথা বলব না—কলকাতা পর্য্যন্ত রেলেই এসেছিলুম, একজনা ভাড়া দিয়েছিল। বাকী পথটা হেঁটে গিয়েছি, আবার বোধ হয় সব পথটাই হেঁটে ফিরতে হবে। তাই ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি, শুনেছিলুম কুণ্ডুবাবুদের ঠাকুর বাড়ী প্রসাদ পাওয়া যায়, থাকবার আশ্রয়ও বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। মাগীর পা ফেটেছে, গাঁটে ব্যথা, দু-একটা দিন না জিরিয়ে চলতে পারবে না।'

এই পর্য্যন্ত বলে বোধ হয় দম নেবার জন্থই বাবাজী একটু থামলেন। কিন্তু তখনও সাধুবাবার দৃষ্টি জিজ্ঞাসু হয়ে আছে দেখে বললেন, 'যাচ্ছিলুম ঐ দিকেই, পথে একটি ভদ্রলোক আপনার সন্ধান দিলে, তাই ভাবলুম যে যখন এই পথেই এসে পড়েছি তখন এমন সুযোগ আর ছাড়া উচিত নয়। এতবড় একজনা সাধু যেকালে এখানে রয়েছেন সেকালে একবার শ্রীচরণ দর্শন করেই যাই!'

এই পর্য্যন্ত বলে বাবাজী ভক্তিভরে আর একটি প্রণাম করলেন। সাধুবাবার দৃষ্টি যেন এবারে প্রসন্ন হল একটু, তিনি দাওয়ার কোণে গুটোনো একটা মাদুর দেখিয়ে দিয়ে বললেন 'ঐটে টেনে নিয়ে বসো। একটু বিশ্রাম করো। মুখ হাত ধুতে চাও ত এই ঘরের পিছনের রাস্তা দিয়ে নদীতে যেতে পারো, ঘাট আছে!'

কিন্তু বিশ্রাম করার জন্য যতটা সময় লাগা উচিত তার অনেকখানি বেশী সময়ও কেটে গেল, তবু বাবাজী মশাই মাদুর ছেড়ে উঠলেন না। বরং পুঁটুলি থেকে হুঁকো কলকে বার করে জমিয়ে বসে তামাক খেতে খেতে হাত-পা নেড়ে

শ্রীবৃন্দাবনের গল্প করতে লাগলেন। সাধুবাবার অত দেশ ঘোরা ছিল না, প্রথম যৌবনে গুরুর সঙ্গে এধারে চন্দ্রনাথ কামাখ্যা আর ওধারে গয়া কাশী প্রয়াগ পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছিলেন। তারপর কিছুদিন দেওঘরে কাটিয়ে সেই যে গঙ্গাসাগরের ফেরৎ এখানে এসে আস্তানা গেড়েছেন, আর কোথাও নড়েন নি। সুতরাং এসব গল্পে তাঁরও নেশা লাগে, তিনি বসে বসে শোনেন, বাবাজী মশাই এক হাতে হুঁকোটা ঝুলিয়ে ধরে বলে যান, 'ওখানে বাবা বুঝলেন, এদেশের মত চাল ভিক্ষে দেওয়া নেই। সব রুটি। মাধুকরী যত বাড়ীই করুন না কেন, রুটি জমবে শুধু। কেউ আধখানা, কেউ সিকিখানা কেউ বা পুরো রুটি দেয়। সব রুটি ত আর লাগেনা, বিশেষত বাঙ্গালী যাঁরা আছেন তাঁদের মাঝে মাঝে ভাত না খেলে চলেও না, কাজেই রুটি যা বাঁচে অনেকে আবার রোদে শুকিয়ে রেখে দেন। সেই সব রুটি জালায় জমানো থাকে, বর্ষাকালে যখন মাধুকরী করার অসুবিধা কিংবা অসুখ-বিসুখে যখন বেরোতে পারে না তখন সেই সব রুটি বার করে গরম জলে তার গায়ের ছাতা ধুয়ে ভিজিয়ে এক পয়সার দই আর গুড় মেখে খায়। ভিখিরীর দেশ বুঝলেন না বাবা, বড় গরীবের দেশ, আকবর বাদশা ওর নাম রেখেছিলেন ফকিরাবাদ—এখনও সেই ফকিরাবাদই আছে। কিছুটি ফেলবার যো নেই।"

কথা থামিয়ে উপরি উপরি দুটান দিয়ে নেন বাবাজী। হতাশ হয়ে বলেন, 'নাঃ, গল্প করতে করতে নিভে গিয়েছে। তবে বুঝলেন বাবা, আমার অন্ন প্রসাদের অভাব হয় না। বাঙ্গালীর ঠাকুরবাড়ী ত আছে দু-একটা, সেখান থেকে বলে কয়ে এক এক মুঠো অন্ন ব্যবস্থা করে নিয়েছি। একটা পারসও পাই, একজনের মত পুরো প্রসাদকে ওরা বলে পারস—তাতে অবিশ্যি ভাত রুটি দুই থাকে। তা মিলিয়ে মিশিয়ে একরকমে চলে যায়। তা বলে অমন উঞ্ছবৃত্তিও নেই, সাত মাসের শুকনো রুটি গরম জলে ভিজিয়ে খাবো—প্রসাদ আমার মাথায় আছেন—অমন খাওয়ার মুখে ঝাড়ু মারি!'

কিন্তু শুধু গল্পে বেলাই বাড়ে। বাবাজীর সঙ্গের স্ত্রীলোকটি, চন্দ্রাবলী তার নাম, সে উসখুস করে। থেকে থেকে এক সময়ে বলেই ফেলে, 'বাবাজী এখনও গল্প করছ—এর পর গেলে কি আর প্রসাদ পাবে? পেটে কিল মেরে থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ—পেটে কিল মেরে থাকতে হবে। মাগীর যা বুদ্ধি, এতবড় সাধুর চরণে যখন একবার এসে পৌঁচেছি তখন আর কি ভাবি। যা হয় হবে। আর রাধারাণী যদি অন্ন মাপিয়ে থাকেন তাহলে তা মিলবেই।'

সাধুবাবারও হুঁস হয়। নড়ে চড়ে উঠে গাছের ছায়ার দিকে চেয়ে বলেন, 'এত বেলায় আর প্রসাদ পাবে না সত্যিই, তা ছাড়া আগে থাকতে না জানালে এখানে মেলেও না। এখন আর আগের দিন নেই, ভোগ রান্না হয় হিসেব করে। তার চেয়ে এক কাজ করো, চাল ডাল দিচ্ছি, পাতা-লতা জ্বেলে দুটো ফুটিয়ে নাও। ওবেলা তখন ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা করো'খন।'

হাত বাড়িয়ে আর একদফা সাধুর পায়ের ধূলো নিয়ে বাবাজী বলেন, 'দেখলি মাগী, দেখ্। মানুষ চিনি যে আমরা, সাধ করে কি আর নিশ্চিন্তি হয়ে বসে আছি!'

রান্না-খাওয়া শেষ করেও চন্দ্রাবলী চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না। বাগান ঝেঁটিয়ে শুকনো পাতা জড়ো করে, নারকেল পাতা কেটে একদিকে জমা করে রাখে। নিজেই কোথা থেকে একটা ন্যাকড়া জোগাড় করে সাধুবাবার ঘরের দাওয়া, তুলসীতলা নিকিয়ে ঝকঝকে করে। সাধুবাবার হাত থেকে তাঁর পূজোর বাসন কেড়ে নিয়ে খাল থেকে মেজে আনে। তার ভাবভঙ্গী দেখে একবারও মনে হয় না যে সে পথশ্রমে ক্লান্ত।

সাধুবাবা একটু হকচকিয়ে যান বৈকি! প্রথম প্রথম উৎপাত বলে মনে হয়েছিল কিন্তু পরিচ্ছন্ন উঠান ও পরিষ্কার দাওয়ার দিকে চেয়ে তিনি প্রসন্ন হয়ে ওঠেন। এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। ছোটবেলা বাড়ীর কাছে ঐ গঙ্গাসাগরের ফেরৎই একদল সাধু এসে আস্তানা গেড়েছিল, তাদের কাছে এসে বসতে বসতে গাঁজা আর ঘি-চপচপে হালুয়ায় নেশা লাগে, একদিন বাড়ী-ঘর ছেড়ে তাদের দলের সঙ্গেই ভেসে পড়েন। তারপর থেকেই বলতে গেলে পথে পথে—শীতকালে ধুনি জ্বালিয়ে গাছতলায় কাটাতে হয়েছে কতকাল। সুতরাং এখানে এসে আশ্রয় একটা পেলেও গুছিয়ে ঘর-কন্না করার মত অভ্যাস তাঁর কোনদিনই হয়নি। কোনমতে পুজা পাঠ আর রান্না সারতেন। পরিচ্ছন্নতার মধ্যে জীবন-যাত্রা যে বেশী তৃপ্তিদায়ক হয় এমন কথা মনেও হয়নি কখনও। যখন নিতান্ত অগোছালো হয়ে পড়ত শিষ্য শিষ্যারা কেউ কেউ এসে একটু গুছিয়ে দিয়ে যেত। তাই এই নতুন অভিজ্ঞতাটা তাঁর কাছে অভিনব বলে মনে হয়, কথার ফাঁকে মধ্যে মধ্যে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন।

বাবাজীর কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য নেই। কাজ তিনি করতে পারেন না, ওসব বোঝারও চেষ্টা করেন না। তামাক আর গল্প, এই দুটিই তাঁর প্রিয়। সন্ধ্যার সময় হরিনামের মালা নিয়ে জপে বসেন বটে, কিন্তু জপের চেয়ে গল্পটাই চলে বেশী। মালাটা মাথায় ঠেকিয়ে বলতে শুরু করেন, 'আমাদের বুঝলেন না, রাধারাণীর রাজত্বে খাওয়ার অভাব নেই। ভেখ্ধারী বৈষ্ণব আমরা, ভিক্ষা করেই আমাদের খাওয়া নিয়ম। তবে ঐ যা বলেন, মাধুকরীতে খাওয়ার অভাব থাকে না বটে পয়সা মেলে কম। অবিশ্যি তারও ব্যবস্থা আছে একটা, এক মারোয়াড়ী ওখানে সদাব্রত খুলেছে, সকালে বিকেলে দুঘণ্টা করে তার ওখানে নাম গান করলে সকালে চাল আটা বিকেলে শুধু ছটা করে পয়সা পাওয়া যায়। চাল আটা ত আর অত লাগে না, বিক্রী ক'রেও দু'পয়সা হয়। দিন কেটেই যায় একরকম ক'রে।'

কখনও বা বলেন, 'জিনিষপত্র ওখানে বাবা জলের দাম ছিল। রাবড়ী চার আনা আর দুধ চার পয়সা এ বরাবরই মিলত। বছরে দুবার মেলা হয়, ঝুলনে আর দোলে—সেই সময়ই যা একটু আক্রা হ'ত আগে। রাবড়ীটা আট আনা এমন কি কখনও কখনও দশ আনাও হয়েছে। এই পোড়ার যুদ্ধ বেধেই ত সব আগুন লেগে গেল। তবু বলব সাধুবাবা, এখানে যেমন আকাল আমার রাধারাণীর রাজত্বে তেমন নেই! এখনও ধরুন না—গোকুলের দিকে—'

সাধুবাবার মন তাঁর গল্প থেকে ফিরে আত্মস্থ হয়ে ওঠে। এখানকার এই বন-ডোবা-বাঁশঝাড় ছেড়ে কোথায় কোন্ সুদূর না-দেখা বৃন্দাবনে চলে যান তিনি। সেখানে মুক্তালতারা মাথা হেঁট করে আছে আজও। আজও সেখানে বঙ্কুবিহারীর ঘুম ভাঙ্গবার ভয়ে টিক্‌টিকি ডাকে না, সকালে কাক থাকে নীরব। পুরোনো শহরের যে রাস্তাটা বঙ্কুবিহারীর গলির মোড় পার হয়ে মদনমোহনের পুরোনো মন্দির ছাড়িয়ে নির্জ্জন ও অন্ধকার যমুনা পুলিনের দিকে চলে গিয়েছে—সে রাস্তাটা যেন তিনি চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পান। গোকুল, কাম্যবন, রাধাকুণ্ড যেন মনে হয় কত পরিচিত।

শুধুই কি বৃন্দাবন! বাবাজী মশাই বহু তীর্থে ঘুরেছেন এই বয়সেই। কথায় কথায় সে-সব প্রসঙ্গও ওঠে। মিনিট কয়েক নীরবে মালা ঘুরিয়েই একবার ক'রে বকতে শুরু করেন, 'ভক্তি যদি দেখতে হয় বাবা ত নাথদ্বার যান একবার। ব্যাটারা সিদ্ধি খায়, গাঁজা খায়, কঞ্জুষ সবই মানি কিন্তু ঐ কাঠ-খোট্টা গোঁয়ারগুলোর যে কী ভক্তি কি বল্‌ব। দেখলে চোখে জল আসে, সত্যি। ভাবি রাধারাণী আমাদের কবে এমন ভক্তি দেবেন।'

সাধুবাবা মৃদুকণ্ঠে একবার বলেন, 'বাবাজী মশাই-এর অনেক জায়গা ঘোরা আছে দেখছি!'

'ঘোরাই ত কাজ ছিল বাবা! যেদিন থেকে ভেখ নিলুম, সেদিন থেকেই ত স্বাধীন। এই কাঁথা আর ঝুলি নিয়ে বলুন না পৃথিবী বেড়িয়ে আসছি।

তবে কি জানেন, এখন বড় জব্দে পড়েছি। গুরুদেব রজ পেলেন, তাঁর ঐ আস্তানার ভার পড়ল আমার ওপর। গিরিধারী আছেন—কিছু জুটুক না জুটুক, একটু গুড় দিয়েও নিদেন দুবেলা তাঁর সেবা করতে হয়। ছাড়তেও পারিনে। তাহ'লে ঘরটুকু যায়। বুড়ো হচ্ছি, এখন একটা আশ্রয় মাথার ওপর না থাকলেও চলে না। নইলে আগে—বছরে ন মাসই ঘুরতুম। ঐ ত সরলা, ওকেও কুড়িয়ে পেয়েছিলুম এক তীর্থেই। সরলা মানে আমাদের এই চন্দ্রাবলী, চন্দ্রাবলী ওর ভেখের নাম, ভেখ নেবার আগে সরলাই ছিল। সেবারে পুষ্করে গিয়ে দেখি ওর ওলাউঠো-মত হয়েছে, সঙ্গের লোকেরা ফেলে পালিয়েছে। পাণ্ডার ঘরে উঠেছিল, তারাও ভয় পেয়ে রাস্তায় বার ক'রে দিয়েছে। বাঙ্গালীর মেয়ে বেঘোরে পথে পড়ে মরবে, এটা আর দেখতে পারলুম না। তুলে হাসপাতালে নিয়ে এলুম, ওষুধপথ্যির ব্যবস্থা করলুম। ব্যস্ আর যায় কোথা! মাগী সেই যে কাঁঠালের আঠার মত জড়িয়ে ধরলে আর ছাড়াতে পারলুম না। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ! রাধারাণীর মনে যা ছিল তিনি তাই করলেন। এতকালের সাধনভজন সব গেল!'

চন্দ্রাবলী সারাদিন ভূতের মত খেটে উঠোনেই একটা ছেঁড়া চ্যাটাই পেতে শুয়েছিল, হয়ত সে তন্দ্রামগ্ন জেনেই বাবাজী মশাই সাহস ক'রে কথাগুলো বলেছিলেন .কিন্তু এখন দেখা গেল কথাগুলো ঠিকই তার কানে পৌঁচেছে। সে উঠে এসে বাবাজীর মুখের কাছে হাত নেড়ে বললে, 'আ মরণ! মালা হাতে ক'রে কেমন নির্জ্জলা মিথ্যেগুলো বলে যাচ্ছে দেখ না। আমি তোমাকে বলিনি কতবার যে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার পথ দেখি। ন' বছরে বিধবা হয়েছিলুম, বত্রিশ বছরে তোমার সঙ্গে দেখা, এর ভেতরে অতিবড় শত্রুও আমাকে একটা কথা বলতে পারেনি। আমি ওঁর সাধন-ভজনে ব্যাঘাত করলুম, ওরে আমার সাধন-ভজনওলারে!'

গতিক খারাপ দেখে বাবাজী আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করলেন না,

আপন মনেই মালা জপে যেতে লাগলেন, যেন কথাগুলো তাঁর কানেই পৌঁছয়নি। চন্দ্রাবলীও আর কথা বাড়ালে না, সাধুবাবার পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করে বললে, 'দিন ঠাকুর পা-দুটো একটু ছড়িয়ে, টিপে দিই।'

সাধুজী বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'নারায়ণ, নারায়ণ। এসব আমি পছন্দ করি না, তাছাড়া মেয়েছেলে মহামায়ার অংশ, তাঁদের হাতের সেবা কি নিতে আছে। তুমি শোওগে, আমার পা টেপ্‌বার দরকার নেই—'

চন্দ্রাবলী ঘাড় নেড়ে বললে, 'না বাবা, সে শুন্‌ব না! যখন অনেক পুণ্যে আপনার দর্শন পেয়েছি তখন এটুকু আর ছাড়ছি না। চিরকাল ত ঐ ভণ্ড বিট্টলের পা টিপে নরকেই ডুব্‌ছি, আজ একটু উদ্ধার হই। এ দয়াটুকু করতেই হবে আপনাকে।'

এই বলে সে একরকম জোর করেই সাধুবাবার পা টিপ্‌তে বসল। তিনি কতকটা অভিভূতের মতই তার সেবা নিলেন। ইদানীং তাঁর একটু বাতের মত হয়েছিল, কখনও কখনও শিষ্যশিষ্যা কেউ তেল মাখাতে বা সেবা করতে এলে ভালই লাগত, তবু তিনি নিজে থেকে কাউকে বলতেন না বরং সাধ্যমত বাধাই দিতেন। কিন্তু আজ চন্দ্রাবলীর পদসেবা পেয়ে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল তাঁর—পা টেপারও যে ভালমন্দ আছে সেটা আজ বুঝতে পারলেন। তার সেবায় সমস্ত স্নায়ু যেন আরামে শিথিল হয়ে আসে।

বাবাজী মশাই মৃদু মন্তব্য করলেন, 'তা মাতাজী পা টেপে ভাল—কী বলেন বাবা? ঐ জন্মেই-ত আরও—রাধারাণী যে কী মায়ায় জড়িয়ে ফেললেন!'

সে রাত্রিটা ওদের সাধুবাবার দাওয়াতেই কাটল। পরের দিন তিনি নিজে গিয়ে কুণ্ডুবাবুদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন। স্থির হ'ল যে ঠাকুরবাড়ী থেকে একবেলার মত প্রসাদ দু'জনকে দেওয়া হবে সাত দিন। আর

একবেলার ব্যবস্থা করতে হবে ওদের ভিক্ষে করে। অবশ্য তাতে বাবাজী মশাই দমলেন না, বললেন, 'তা হোক্ না বাবা কণ্ট্রোলের আমল, তা বলে দুটো প্রাণী কি আর না খেয়ে মরব? সে ঠিক রাধারাণী জুটিয়ে দেবেন।'

ফলে এই দুটি মানুষ বেশ জাঁকিয়েই বসলেন সাধুজীর আশ্রমে। কুণ্ডু-বাবুদের মন্দির-সংলগ্ন যে ভাঙ্গা অতিথিশালা ছিল সেখানে যে একেবারে থাকা চলত না তা নয়, কিন্তু সাধুবাবা মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারলেন না কিছুতেই। ওরা দাওয়াতেই থাকে আর উঠানে রেঁধে খায়, এইভাবেই চলে ওদের।

কিন্তু প্রথমটা ওদের সাহচর্য্যে একটা নেশা লাগলেও সাধুজী বুঝতে পারলেন দুদিনেই যে, কাজটা তিনি ভাল করেননি। নির্জ্জন শ্মশানে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, দিনরাত কলরব তাঁর সহ্য হয় না। বাবাজীর অবিশ্রান্ত বকুনি যদি-বা সয়, ওদের আপোষে যে অবিরাম কলহ চলে সেটা সাধুজীর স্নায়ু সইতে পারে না। বিশেষতঃ পূজার সময়। সাধুজী ভোরেই উঠতেন কিন্তু চন্দ্রাবলী আর বাবাজী মশাই আরও ভোরে ওঠেন। ফলে তাঁর পূজা-ধ্যানের সময়টুকুও শান্তি পান না। শেষ পর্য্যন্ত ঘর ছেড়ে সরস্বতীর ধারে গিয়ে বসতে শুরু করলেন।

অথচ এর যে কোন প্রয়োজন নেই তা সাধুবাবা ভাল করেই জানেন। 'যাও' বললেই ওরা চলে যাবে। ওদের কোন জোর নেই—জোর করে থাকবেও না এটা ঠিক। তবু সাধুজীরই যেন সঙ্কোচে বাধে।

কিন্তু শুধুই কি সঙ্কোচ?

এ প্রশ্নও নিজেকে করেন বৈ কি মধ্যে মধ্যে! চন্দ্রাবলী এসে তাঁর আশ্রমের শ্রী ফিরিয়েছে। ঘর-দোর নিকোনো ঝক ঝক্ করে আজকাল। রান্নার জায়গাটি এত পরিচ্ছন্ন থাকে যে সাধুজী খুশী না হয়ে পারেন না। জিনিষপত্র সব নতুন করে ঝাড়ামোছা সাজানো হয়েছে। তাঁর খড়ের ওপরে

হরিণের ছাল পাতা বিছানাটাই এত আরামদায়ক হয়ে উঠেছে যে সেখানে শুলে আজকাল যেন সহজে ঘুম আসতে চায় না। রান্না অবশ্য তিনি রোজ করেন না কিন্তু যেদিন করেন সেদিন আর আগের মত তাঁকে বিব্রত হতে হয় না। উনান ধরাবার কাঠ-কুঠো থেকে শুরু করে কোটা-কুটনো, ধোয়া চাল পর্য্যন্ত সব হাতের কাছে পান। তারপরের কাজগুলো অর্থাৎ রান্নার স্থান পরিষ্কার করা বা বাসনমাজা, তার জন্যও ভাবতে হয় না। এ আরাম দু'দিনের, চন্দ্রাবলী চলে গেলে আবার তাঁকে পুনর্মূষিক হতে হবে—এ সবই সাধুজী জানেন, তবু এই স্বাচ্ছন্দ্যের, এই সেবার কেমন একটা নেশা লাগে যেন, জোর করে এটা বন্ধ করতে পারেন না।

অনুযোগও করেন অবশ্য মধ্যে মধ্যে ; হয়ত বলেন, 'চন্দ্রাবলী এসব বদ্ অভ্যাস ধরানো কি ঠিক ? সন্ন্যাসী মানুষ চিরকাল শ্মশানেই কাটাতে হবে—শুধু শুধু দু'দিনের জন্য—'

চন্দ্রাবলী সেসব অনুযোগ গায়ে মাখে না। বলে, 'হোক্ না ঠাকুর দু'দিন। আপনি সাধু, আপনার ত সব অবস্থাই সমান। আপনি আর কিসের অভাব বোধ করবেন বলুন! মাঝখান থেকে আমার যদি একটু পুণ্যি হয়ত বাধা দেন কেন ?'

কিন্তু শুধু চন্দ্রাবলীর সেবাই নয়—বাবাজী মশাইয়ের গল্পেরও কেমন একটা জাদু আছে, নিজের কাজ সারা হলেই মন তাঁর সঙ্গ চায়। এতদিন কোথাও যান্‌নি, তার অভাব-বোধও ছিল না মনে কিন্তু এখন যেন বাবাজীর গল্পের পিছু পিছু মন সব ফেলে রেখে ছুটে চলে যেতে চায়। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তীর্থগুলি যেন বায়স্কোপের ছবির মত দ্রুত সরে যেতে থাকে আর মন হয়ে ওঠে উতলা—কিছুতে, কোনমতেই এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধা থাকতে চায় না।

বাবাজী হয়ত বলেন, 'যদি কখনও কেদারবদরী যান ত দেখবেন যে নদীয়

আওয়াজ কি! অলকানন্দার গর্জ্জনে একদিন ঘুমই হ'ল না সারারাত। তবে তা-ও বলি বাবা, যা দেখেছি জীবন সার্থক হয়ে গেছে। হিমালয় পাহাড় যে দেখলে না তার জীবনই বৃথা। হরিদ্বার থেকেই শুরু হ'ল বটে তবে যত এগোবেন ততই অবাক্ হয়ে যাবেন!'

আবার কখনও বলেন, 'অনেকে বাবা রামেশ্বর দেখেই ফিরে আসে কিন্তু আমি বলি, যে কন্যাকুমারী দর্শন করলে না, তার ত তীর্থ করাই মিথ্যে হ'ল। সে কী স্থান—চোখ জুড়িয়ে যায়, ইচ্ছে করে না যে আর ফিরি।'

কিম্বা 'যে যতই বলুক বাবা, হোটেল ত বলি জগন্নাথের। এখন কি হয়েছে জানি না, আগে চার পয়সার অন্ন প্রসাদ, এক পয়সার ডাল আর এক পয়সার তরকারী কিনলেই একটা লোকের পেট-ভরা হয়ে যেত। আর সে কী সোয়াদ বাবা, কি বলব! তেল নেই, লঙ্কা নেই, কোন মশলার বালাই নেই শুধু সেদ্ধ ডাল, তা-ই যেন আজও জিভে লেগে আছে।'

এমনি করে দ্রুতবেগে বাবাজী এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে চলে যান, হাজার হাজার মাইল পথ যেন চক্ষের নিমিষে লাফিয়ে পার হন। তাঁর কল্পনার সেই উদ্দাম দ্রুত বেগে সাধুবাবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, সব সময়ে যেন তাঁর নাগাল ধরতে পারেন না। তবু বার বার শুনে কোথায় কি দ্রষ্টব্য আছে, তাঁরও মুখস্থ হয়ে যায়। অযোধ্যা কি বৃন্দাবনের নাম হলেই নিজের অজ্ঞাতসারে সাধুবাবা বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন, কোথাও বানর বসে আছে কি না।

সুতরাং ওঁদের অবস্থানটা যখন সাতদিন থেকে কুড়ি-একুশ দিনে এসে পৌঁছল, তখনও সাধুজী ওদের চলে যাবার কথাটা বলতে পারলেন না। শেষে বললেন একদিন ওঁরা নিজে থেকেই—সন্ধ্যাবেলা অনেকদিন পরে কোথা থেকে

একটু গাঁজা সংগ্রহ করে তরিবতের সঙ্গে সাজতে সাজতে বাবাজী বললেন, 'অনেকদিন আপনার আশ্রয়ে কাটল বাবা, এইবার ত পথ দেখতে হয়!'

সাধুবাবা যেন চমকে উঠলেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'সে কি, এরি মধ্যে যাবে?'

'আর এরই মধ্যে কি বাবা, বেরিযেছি কি আজ? ভেবেছিলুম দোলের মধ্যেই ফিরব, তা ত হ'ল না। ফাল্গুন মাস পড়েই গেল—এখন কত দিনে ফিরতে পারব, তারও ঠিক নেই। গাড়ীভাড়াটা যদি এখান থেকে তুলে নিতে পারি সেই চেষ্টায় ছিলুম—তা গোটা পনেরোর বেশী কিছুতে তুলতে পারলুম না। যাই হোক—কাশী পর্য্যন্ত ত' যাই, তারপর ওখানে কিছু জোগাড় করতে পারি ভালোই, নয়ত এমনিই চড়ে বসব, যা করেন রাধারাণী। এক-এক বেটা টিকিট-চেকার থাকে বড় পাজী—মারধোর করে, এই বড় ভয়। নইলে আর কি—এত তীর্থ কি আর সব টিকিট কেটে ঘুরেছি?'

সাধুবাবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বললেন, 'তা দোলের মধ্যে যখন ফিরতে পারলেই না, তখন আরও কটা দিন থেকে যাও না—যদি গাড়ীভাড়াটা ওঠে।'

'হ্যাঁ—এ যা জায়গা! এই যা উঠেছে—আপনি ছিলেন বলে তাই, নইলে কিছুই হত না। তা-বাদে স্থান-ছাড়া বহুদিন, বুঝলেন না, গিরিধারী রয়েছেন। পাশের কুঞ্জের এক বেটা পূজারীকে বলে এসেছিলুম বটে, তা সে কী করছে, কে জানে। হয়ত ঠাকুর উপবাসীই থাকছেন। একখানা ঘরে ভাড়াটে আছে তিন টাকা দেয়, সেই টাকাটাই পূজারীর নেবার কথা, টাকাটা নিয়ে ঘরেই বসে থাকছে হয়ত, তার ঠিক কি! সে ভাড়াটেও আবার তেমনি—হয়ত দোর-জানলাই বেচে খাচ্ছে এতদিনে।'

তারপর গোটা দুই বড়গোছের টান দিয়ে কাশতে কাশতে বললেন, 'আমি বলি কি সাধুবাবা, আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে চলুন। মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল সব

আমি নিজে ঘুরে দেখিয়ে দেব। ওখান থেকে চাই কি এধারে পুষ্কর ওধারে হরিদ্বার অবধি ঘুরে আসতে পারবেন। যদি সুবিধে পাই, মাগী যদি রাজী হয় ত' ওকে বৃন্দাবনে রেখে আমিও আর একবার আপনার সঙ্গে ভেসে পড়ব।'

খুবই লোভনীয় প্রস্তাব, কথাটা তিনি নিজেও যে দু-একবার চিন্তা করেন নি তা নয়, তবু কণ্ঠস্বরে একটু জোর দিয়েই বললেন, 'তা কি আর হয়। যা হয় আস্তানা একটা গেড়ে বসেছি, এরা ঘরদোরও তুলে দিয়েছে এখন ছ মাস এক বছর বাইরে থাকলে এসব নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে কেউ নেই যে, শ্মশানে এসে আমার ঘরদোর আগলাবে। তাছাড়া আমারও ত ঠাকুর রয়েছেন! তাঁর কি করব?'

'ঠাকুর! ও ঝুলির মধ্যে করে নিয়ে যাবেন—তাতে কি হয়েছে?……আর ঘরদোর না হয় গেলই—যারা করে দিয়েছে, তারাই আবার করবে।'

'হ্যাঁ—তাই কি সম্ভব! এই বাজারে কে কতবার দিতে পারে? আগেকার তৈরি তাই, এখন হলে আর মোটেই হত না।'

'তা না হয় নাই বা হ'ল বাবা। আপনি সন্ন্যাসী আপনার যে এক জায়গাতেই বরাবর মাথা গুঁজে থাকতে হবে তার ঠিক কি? তাহলে ত ঘরকন্না পাতলেই পারতেন।……আপনি যেখানেই যাবেন, সেখানেই আশ্রয় মিলবে আপনার। না হয় বৃন্দাবনেই থেকে যাবেন। বৃন্দাবন ভালো না লাগে যে কোন তীর্থে গিয়ে বাস করবেন। আপনার আবার থাকার ভাবনা কি?'

তা বটে। মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়েন সাধুজী। তাঁর অন্ততঃ ঘরকন্নার মায়া শোভা পায় না। বরং এক জায়গায় এমনভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবাস করাই হয়ত অন্যায়, এখানকার লোকের ওপর বোধ হয় একটু অন্যায় জুলুমই হচ্ছে।

তবু একটুখানি চুপ করে থেকে সাধুজী কৈফিয়ৎ একটা দিলেন, 'স্থানটা নির্জ্জন, মন স্থির করে সাধন-ভজন করা যায়। তীর্থস্থানে বড় কোলাহল, বড়

অনাচার। ওসব জায়গায় এমনিই এত সাধু আছে যে, সকলকেই লোকে ভণ্ড ভেকধারী সন্ন্যাসী মনে করে। মনে করে শুধু পেট কা ওয়াস্তে—'

ততক্ষণে গঞ্জিকা-প্রসাদাৎ বাবাজী মশাই রীতিমত তেতে উঠেছেন। হাত-পা নেড়ে বললেন, 'বেশ ত, দরকার কি আপনার তীর্থে গোলমালের মধ্যে থাকবার। ওখানে কি আর নির্জ্জন স্থান নেই? ধরুন না কেন, গোকুলেই যদি গিয়ে বাস করেন—কিংবা হিমালয়ের ওপর কোথাও। তীর্থগুলো ঘুরে নিন আগে তারপর যেখানে মন যাবে সেখানেই গিয়ে থাকবেন। চলুন, চলুন—আর দ্বিমত করবেন না।'

ইতিমধ্যে কাজ সেরে চন্দ্রাবলীও পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেও কণ্ঠস্বরে অনুনয়ের সুর এনে বললে, 'তাই চলুন ঠাকুরমশাই—তবু দুদিন বেশী সেবা করতে পারব আপনার। আমরা সঙ্গে থাকলে যেখানেই যান না কেন, সেবা-শুশ্রূষার অভাব হবে না।'

'দেখি একটু ভেবে—' সাধুজী শুষ্ককণ্ঠে মন্তব্য করেই চুপ করে যান।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পায়ে তেল মালিস করতে এসে চন্দ্রাবলী আবার সেই কথাই তুললে। তারপর যেন ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই বললে, 'কী ভেবে দেখলেন ঠাকুর মশাই?'

সাধুজী কি যেন ভাবছিলেন, এই প্রশ্নে চমকে উঠে বললেন, 'না চন্দ্রাবলী, এখনও কিছু ভেবে দেখিনি—'

'চলুন—ঠাকুর মশাই, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—'। হঠাৎ কণ্ঠে যেন একটা আকুলতা ফুটে ওঠে চন্দ্রাবলীর। সাধুজী বিস্মিত হয়ে তাকান ওর মুখের দিকে। প্রদীপের ক্ষীণ আলো, তবু তাইতেই ওর মুখের ভাব দেখে তিনি বোঝেন যে, এ অনুরোধ ও অনুনয় আন্তরিক।

'কেন বলো ত? মিছিমিছি আমাকে টানতে চাইছ কেন?'

কিন্তু ততক্ষণে চন্দ্রাবলী বোধ হয় লজ্জিত হয়ে পড়েছে। সে মাথা নীচু করে বললে, 'না কিছু নয়। এমনিই—আপনি ত দেখেন নি কিছু—বেশ ঘুরে ঘুরে দেখতেন। অজানা জায়গায় আমরা সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হত।'

চন্দ্রাবলী আর কিছু বললে না। অন্য দিনের চেয়ে বরং কিছু কম সময়েই সে পদসেবার কাজ সেরে প্রদীপ নিভিয়ে সাধুজীর ঘরের আগড় বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু সাধুজীর ঘুম কিছুতেই এল না। ফাল্গুনের প্রথম, তবু এরই মধ্যে হাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠেছে, সে হাওয়াতে শীতের তন্দ্রা মাখানো নেই—বসন্তের উত্তেজনাই আছে, এমনিতেই ঘুম আসা শক্ত। সাধুজীও জেগে বহুক্ষণ এপাশ ওপাশ করলেন। শুক্লপক্ষের গোড়ার দিক, চাঁদ এরই মধ্যে অস্তাচলে চলেছেন, ঘরের সামান্য একটুখানি জানলা দিয়ে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সাধুজীর মাথা নানা চিন্তাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।......

এসব কিছুই জানতেন না তিনি, কোনদিন ভেবে দেখবার প্রয়োজন হবে তা-ও মনে করেন নি। বাল্যকালেই ঘর-ছাড়া, সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মানুষ। সাধন-ভজনের প্রতি কোন উগ্র আকর্ষণ ছিল না। ওটাকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে, অভ্যাস হিসাবে সহজভাবে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধেও কোন কৌতূহল, কোন ক্ষোভ মনের মধ্যে বহন করেন নি তিনি। জীবন-ধারণের স্থূল প্রয়োজনগুলো মানতেন, সে সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন যথেষ্ট, কিন্তু মানুষের জীবনপ্রবাহ নিয়ে মাথা ঘামাননি কখনও। ও-জীবন তাঁর জন্য নয়—এই জেনেই নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত ছিলেন। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এ সংস্কারটা আপনা থেকেই চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে গেছে কোথায়। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের আরামটা মন আজ চাইতে শিখেছে, সেটা পেলে তিনি খুশী হন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এমন কি কথাটা তিনি এইমাত্র বুঝতে পারলেন—তাঁর জন্য কেউ চিন্তা করে, তাঁর সাহচর্য্য কামনা করে এমন একজনও আছে—এটা

জানতে পারলেও তিনি খুশী হন! একটি মানুষের মানস-প্রদীপে তাঁর চিন্তাই শিখার মত জ্বলছে—কল্পনা করতেও ভাল লাগে যেন।

আজ তিনি বুঝতে পারলেন সংসারের আকর্ষণ এত প্রবল কেন—কিসের জন্য মানুষ এমন জড়িয়ে পড়ে।

এর মধ্যে কোন পাপ নেই—তা তিনি জানেন। তাঁর পক্ষে আর এসব পাপে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়—এ শুধুই সেবা-যত্ন, সাহচর্য্যের লোভ। আর সত্যিই, অজানা তীর্থের পথে যদি পা বাড়াতেই হয় ত, এমন সঙ্গীই প্রয়োজন। এ সুযোগ হয়ত আর না-ও মিলতে পারে। কিন্তু তবু এই মুহূর্ত্তে কোথায় যেন একটা সঙ্কোচে বাধছে। একটা সচেতনতা, জীবনের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে যার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না, আজ যেন তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন জীবন কেটেছে একটা ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে। তার গতানুগতিকতা সম্বন্ধেও কোন দিন কোন প্রশ্ন ওঠেনি, মনোবিকলন ছিল তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটা জিনিষ। অন্যায় তিনি কিছু করেন নি, কিন্তু তা থেকে সতর্ক থাকবারও কারণ ছিল না। তেমন কোন সুযোগও কোনদিন আসেনি। সন্ন্যাসী হয়েছিলেন একদিন সহজেই—আজও সাধু আছেন সহজে। জীবনের বৃত্তি হিসাবেই সন্ন্যাস ছিল তাঁর বলতে গেলে, তবু প্রতারণার কোন প্রশ্ন কোনদিন ওঠে নি।

কিন্তু আজ সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে ভাবিয়ে তুললে। এরই নাম কি মোহ? এই কি অন্যায়কে সঙ্গে ডেকে আনে? এমনি করেই কি প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেন? এইভাবেই কি পদস্খলন হয়?

কে জানে!……

যে ঈশ্বরকে এতদিন যন্ত্রচালিতের মতই, নিয়ম-পালনের জন্য স্মরণ করেছেন, সেই ভগবানকে আজ মন দিয়ে ভাববার চেষ্টা করলেন। মনে হ'ল সন্ন্যাস

তিনি যে কারণেই নিন, যেমন ভাবেই নিন—তার একটা দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা যেন থাকে।

বহু রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র থেকে সাধুজী স্থির করলেন যে, না—প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে আর নতুন করে মায়ায় জড়াবেন না তিনি। ওদেরই বিদায় করে দেবেন, আর তা কালই।

বাবাজী মশাই কিন্তু সকালে উঠে ধরেই নিলেন যে, সাধুবাবা ওঁদের সঙ্গে যাবেন। কোন প্রতিবাদই শুনতে প্রস্তুত নন তিনি। বলেন, 'কী বলছেন বাবা, স্বয়ং রাধারাণী আপনাকে টেনেছেন আপনি না বললে চলবে কেন? এ সুযোগ আর ছাড়বেন না। এ যে তাঁরই যোগাযোগ তা কি বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা চলুন, বৃন্দাবন-হরিদ্বার অযোধ্যা করেই না হয় ফিরে আসবেন, বড় জোর পুষ্করটা—কত আর সময় লাগবে, না হয় মাস-তিনেকই লাগুক। আপনার শিষ্য-যজমানরা এই সময়টা ঘরবাড়ী দেখবেখন।'

সাধুজী লোভে 'দোলাচল-চিত্ত' অবস্থায় অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। চন্দ্রাবলী আজ আর অনুরোধে যোগ দেয়নি, কিন্তু ততক্ষণে নিপুণ-হস্তে সে তার প্রাত্যহিক কাজগুলো করে যাচ্ছে। পূজোর বাসন মাজা হয়ে গেছে, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা সব প্রস্তুত, ঠাকুরের বেদীর সামনে তাঁর আসন পাতা, পূজার সব আয়োজন পরিপাটি করে সাজানো। ওদের গুরুর পট এবং একটি যুগল পায়ের ছাপ সঙ্গে ছিল, তারও একটি আসন বাইরের দাওয়াতেই তৈরি হয়েছিল ইতিমধ্যে—সেখানেও পূজার আয়োজন শেষ হয়েছে। এইবার সে সাধুজীর রান্নাঘরের সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখতে ব্যস্ত। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তিনি একবার কল্পনা-নেত্রে দেখে নিলেন আগেকার তাঁর অপটু জীবনযাত্রার ছবিটা—এরা চলে গেলে আবার সেই অবস্থাতেই ফিরে যেতে হবে। প্রত্যহ নিজের হাতে সব গুছিয়ে নেওয়া,—নিঃসঙ্গ, নির্জ্জন জীবনযাত্রা।

হঠাৎ যেন কী একটা প্রতিজ্ঞায় মন স্থির করে ফেললেন তিনি। বাবাজী মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা চলুন, ঘুরেই আসা যাক্—রাধারাণী টেনেছেন মনে হচ্ছে।'

উদ্যোগ-আয়োজন সামান্যই, এক বেলাতেই তা হয়ে যায়। শিষ্য-শিষ্যাদের ডেকে ঘরের চাবীর ব্যবস্থা করা হ'লো। স্থির হয়েছে, সন্ধ্যার ট্রেণে এখান থেকে গিয়ে হাওড়া থেকে রাত সাড়ে দশটার প্যাসেঞ্জার ধরা হবে। এখান থেকে কাশী যাওয়া হবে আগে—তারপর বৃন্দাবন। সাধুবাবার হাতে কিছু টাকা ছিল, গাড়ী ভাড়ার আপাততঃ অভাব হবে না।

কিন্তু ষ্টেশনে পৌছে আব্ছায়া অন্ধকারে ট্রেণের প্রতীক্ষা করতে করতে সাধুজীর যেন আবার নতুন করে চমক ভাঙল। সত্যই কি তীর্থের টানে তিনি চলেছেন? ভগবানের দর্শনই কি আজকের এই যাত্রার উদ্দেশ্য? না, আর কিছু? যে সংসারকে তিনি একদিন পরিচয়ের আগেই ত্যাগ করেছিলেন, যে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যে ও বিলাসে তাঁর কোন অধিকার নেই—সেই সংসার এবং স্বাচ্ছন্দ্যের লোভই কি আজ জীবনসায়াহ্নে তাঁর মূল ছিঁড়ে নতুন একটা অভিজ্ঞতা, নতুনতর পরিবেশের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছেনা?

সাধুজী যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি যাবেন শুনে চন্দ্রাবলীর মুখ যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এটা তাঁর চোখ এড়ায়নি। সে যে নিপুণ দ্রুত-হস্তে তাঁর ঝুলি সাজিয়ে দিয়েছে, তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন।...সন্ন্যাস সম্বন্ধে এতদিন কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না তাঁর, গুরুর উপদেশের অর্দ্ধেক অর্থই এতদিন উপলব্ধি করতে পারেননি—কিন্তু আজ আব্ছা হলেও কতক কতক তা মনে পড়ছে এবং তার অর্থ বুঝতে পারছেন। সম্পর্ক যাই হোক, কোন মায়াতে জড়িয়ে পড়াই তাঁর উচিত নয়।

ট্রেণ দেখা দিয়েছে দূরে। প্ল্যাটফর্মে ব্যস্ততার অন্ত নেই। সাধুজী কিন্তু তখনও যেন ধ্যানমগ্ন। চন্দ্রাবলী তাঁর পা ছুঁয়ে বললে, 'উঠুন ঠাকুর মশাই,

গাড়ী এসে পড়েছে যে!' তারপর তিনি চোখ চাইতে হেসে বললে, 'এখন থেকে আমিই আপনার অভিভাবক ত, দেখাশোনা আমাকেই করতে হবে।'

ট্রেণ এলে বাবাজী মশাই ছুটোছুটি করে আগেই উঠে পড়লেন। চন্দ্রাবলীও উঠে সাধুজীর ঝুলির জন্যে হাত বাড়িয়ে বললে, 'দিন দিন, ওটা আমার হাতে দিযে উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি। গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে যে!'

কিন্তু সাধুজীর কোন উদ্বেগ দেখা গেল না! তিনি একটু ম্লান হেসে বললেন, 'না চন্দ্রাবলী, এ-যাত্রা আর আমার যাওয়া হল না। রাধারাণী বোধ হয় ঠিক টানেন নি এখনও—তোমরাই যাও।'

ততক্ষণে ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে। ওরা মূঢ়ের মত চেযে মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রইল। সাধুজী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার গ্রামের পথ ধরলেন।

সরস্বতীর শীর্ণ খালের ধার দিয়ে ফিরতে ফিরতে সাধুজীর সবচেযে যে ভাবটা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল সেটা হচ্ছে নিরতিশয় আত্মতৃপ্তি। দেশ ভ্রমণ তাঁর হ'ল না, তীর্থদর্শনের সাধ অপূর্ণ রইল—চন্দ্রাবলীর অতন্দ্র এবং অক্লান্ত সেবা থেকেও বঞ্চিত হলেন—এসবই সত্য, এর জন্য বেদনা অনুভব করছেন-না এমনও নয়—কিন্তু সে বেদনার চেয়েও এই মুহূর্ত্তে তাঁর আত্ম-প্রসাদই বড় হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসের আসল কথাটা এতদিন পরে তিনি বুঝেছেন, অর্থ না বুঝেই একদিন যে জীবনযাত্রা বেছে নিযেছিলেন তার লক্ষ্য এতদিন পরে তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হয়েছে—আর তিনি কোন প্রলোভনেই পা বাড়াবেন না। কোন রকম প্রস্তুতি ছিল না, কোন কৃচ্ছ্রসাধন বা বিরাট তপস্যার ঐতিহ্য থাকা সম্ভব নয়—তবু যে এত বড় প্রলোভন কাটিয়ে উঠেছেন এজন্য নিজের কাছেই তিনি কৃতজ্ঞ।...

......সরস্বতীর পুলের ওপর উঠে নিজের আশ্রমের দিকে চেয়ে দেখলেন। শান্ত স্তব্ধ কুটীরখানি নির্জ্জন শ্মশানের প্রান্তে যেন মূর্ত্তিমতী শান্তির মত দাঁড়িয়ে

আছে। সে দিকে তাকিয়ে মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। এই ভাল তাঁর—এই ভাল। বাইরের হাওয়া এসে লেগেছিল ক্ষণকালের জন্য, কিন্তু সে হাওয়া বয়ে চলে গিয়েছে, তাঁর এই চিরকালের স্তব্ধতাই থাক সারা জীবন ভ'রে। তিনি রাস্তা ছেড়ে শ্মশান পেরিয়েই চলে এলেন দ্রুতগতিতে, বাগানের বেড়ার সামনে এসে একেবারে দাঁড়ালেন। জ্যোৎস্নায় আশ্রমের উঠানটি ভরে গিয়েছে, সে আলোয় আজ যেন নতুন করে সব সুন্দর লাগল। সামান্য কুটীর—তবু এর প্রতি অংশটি তাঁর প্রিয়। ঐ যে মাচার ওপর লাউডগাগুলো লতিয়ে আছে ওর মসৃণ পাতাগুলো যেন তাঁকে দেখে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সন্ধ্যামণি ফুলের ডালটা যেন মাথা দুলিয়ে অভ্যর্থনা করলে, 'এই যে, এসেছ।'

শান্তি আর আনন্দ। নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রারও একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে বৈ কি! পুরাতন পরিবেশের মায়াই বা কম কি।

কিন্তু বেড়ার আগড়টা খুলে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ সাধুজী আর একবার থমকে দাঁড়ালেন। এ কী, একটু আগেই যে সন্ন্যাসের আসল অর্থটা বুঝেছেন বলে মনে মনে বাহাদুরী নিচ্ছিলেন, সামান্যতম বন্ধনের প্রলোভনও কাটিয়ে উঠেছেন বলে আত্মতৃপ্তির অন্ত ছিল না—সে যে এত অর্থহীন তা ত তখন বোঝেন নি। আশ্রম এবং আশ্রয়ের মায়াই বা কম কি? চন্দ্রাবলীর সাহচর্য্য হারাবার বেদনা তিনি যে অত সহজে ভুলতে পারলেন আসলে সেটার কারণ তাঁর মনের বৈরাগ্য নয়, এই নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়ই। এই মায়াই তাকে দুর্ব্বার বেগে টানছিল বলে তিনি এত সহজে ফিরে আসতে পেরেছেন।

বহুক্ষণ, প্রায় আধ ঘণ্টারও ওপর সাধুজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কাঁধের ঝুলিটা বেড়ার ওপর দিয়ে উঠানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে আবার তিনি সরস্বতীর পুল পেরিয়ে ঘন বনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

যাত্রা-সহচরী

সেবার বিহিটার কাছে যে পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনা হয়েছিল তার বিবরণ আপনারা কাগজে নিশ্চয় পড়েছেন। এমন আরও কত দুর্ঘটনাই কত জায়গায় ঘটছে—পাঞ্জাব এক্সপ্রেস, পাঞ্জাব মেল, বোম্বে মেল, দেরাদুন এক্সপ্রেস, দেরাদুন দিল্লী এক্সপ্রেস—এমন কি মাজদিয়াতে আমাদের নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস পর্য্যন্ত। সরকারী খবর বেরোয় এত মরেছে, এত আধমরা—বেসরকারী খবর আসে আরও ঢের বেশী, আর প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সাত মুখ ঘুরে চুপি চুপি কানে কানে যে খবর এসে পৌছয় তার অঙ্কের সঙ্গে সরকারী বেসরকারী কোন খবরই মেলে না। আপনারা সকাল বেলা জেলি-মাখানো সেঁকা-রুটির সঙ্গে চা খেতে খেতে অলসভাবে খবরগুলোয় চোখ বুলোন্, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সরকারী খবরটা যে আগাগোড়াই ধাপ্পা, ওর চেয়ে ঢের বেশী লোক মরেছে, এ সম্বন্ধে আপনার কাছে যে উড়ো খবরটা এসে পৌচেছে সেইটেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য—এইটে প্রমাণ করতে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন! এইভাবে চলে দু'-তিন দিন, তারপর নিত্য-চলমানা পৃথিবীর নতুন নতুন রাজনৈতিক খবরের বন্যায় এসব তুচ্ছ সংবাদ কোথায় ভেসে চলে যায়। কিন্তু অকারণে, নিজেদের বিনাদোষে এই যে লোকগুলি মারা গেল তাদের প্রত্যেকটি লোকের স্বতন্ত্র ইতিহাসের এই আকস্মিক পরিসমাপ্তি নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামায়। যারা মারা গেল তাদের মধ্যে হয়ত সকলেই একেবারে মরেনি, হয়ত তাদের অনেককে সময়ে উদ্ধার করলে, চিকিৎসা করলে বাঁচত —হয়ত বেচারারা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পড়ে একবিন্দু জল কিংবা একটুখানি হাওয়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করেছে, হয়ত বা সেই শেষমুহূর্ত্তেও প্রিয় যে আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে এসেছে কিংবা তাদের চেয়েও প্রিয় জীবনের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে হ'ল, তাদের কথা চিন্তা ক'রে

প্রাণপণে চেষ্টা করছে বাঁচবার জন্ম, আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগেও আশা করেছে যে তার জীবনের পরিসমাপ্তি অন্তত এমন শোচনীয় ভাবে হবে না। সেই অরণ্য-প্রান্তরে অন্ধকারে অথবা মফঃস্বলের অজ্ঞাত, অক্ষম হাসপাতালে যে সমস্ত বিপুল সম্ভাবনা অকালে নষ্ট হ'ল, যে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার শিখা অসময়ে নিভ্‌ল তাদের কথা নিয়ে বিশেষ ভাবে মাথা ঘামাবেন, এমন সময় কই আপনাদের?

হয়ত আমিও মাথা ঘামাতুম না, আপনাদের মত চায়ের পেয়ালার তুফান চা-পানের সঙ্গেই শেষ করে নিজের জীবনের অধিকতর মূল্যবান্ খুঁটিনাটিতে মনোনিবেশ করতুম; বড়জোর পরবর্ত্তী ভ্রমণের সময় কথাটা একবার স্মরণ ক'রে মাঝামাঝি কোন গাড়ীতে ওঠবার চেষ্টা ক'রেই এই সব হতভাগ্যদের জীবনের মূল্যে অর্জ্জন-করা অভিজ্ঞতার মূল্য দিতুম! আমি যে তা পারিনি, আমার পক্ষে যে অত সহজে ব্যাপারটাকে মন থেকে বিদায় দেওয়া সম্ভব হয়নি তার কারণ বোধহয় এই-ই যে, এইরকম একটা দুর্ঘটনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছে, প্রহরের পর প্রহর চারিদিকে অসহায় মুমূর্ষু-লোকের আর্ত্তনাদ শুনেছে অথচ নিজে এতটুকু সাহায্য করতে পারেনি কাউকে, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে অলোক-সাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছে, আমরা যেটাকে দুর্ঘটনা আখ্যা দিয়ে সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যাই সেই চরম নিষ্ঠুরতার প্রতিটি বিন্দু অনুভব করেছে নিজের অপরিসীম দৈহিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, এমনি একটি ব্যক্তির প্রত্যক্ষ-দর্শনের অভিজ্ঞতার অংশগ্রহণ করবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে! আজ সেই গল্পই আপনাদের কাছে বলতে বসেছি—আর কিছু না হোক, সময় কাটাবার উপকরণের বৈচিত্র্য হিসাবেও ত কাজে লাগ্‌তে পারে! তবে যাঁরা এই ভূমিকাতেই বীভৎস রসের আভাস পেয়ে নিজেদের অনুভূতি-প্রবণতা প্রমাণ করবার জন্ম ভ্রু-কুঞ্চিত করবেন তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে তাঁরা এ কাহিনী পড়বেন না!

যার কথা বলতে বসেছি, গল্পটা যে তার কাছে শুনিনি-কথা-বার্তার কারণ সে আর বেঁচে নেই, তার মৃত্যুর কাহিনীই বল্‌ছি। শু৻ বিশেষ দিনের, তার জীবন-দিনান্তের যাত্রাসহচরীর মুখেই। ক৺! হয়ত আমার পরিচিত বই কি! এমন কি তাকে বন্ধু আখ্যা দিলেও অতি'ল কি দায়ে পড়তে হয় না—পরিচয়টা এতই ঘনিষ্ঠ ছিল। ঘ

বিনয় আসছিল সাহারাণপুর থেকে। নতুন কী একটা কন্‌ট্র্যাক্ট নিয়েছিল সাহারাণপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে—তারই তদ্বির তদারক করতে তিন দিনের জন্য ওকে সেখানে যেতে হয়েছিল। ফিরে আসবার পথে বাধ্য হয়েই ইণ্টার ক্লাসে উঠেছিল, সেকেণ্ডক্লাস বার্থ ছিল না। ফার্ষ্টক্লাসে আসবার মত বড় কাজ ওটা নয়—অর্থাৎ এমন কিছু লাভ হবে না।

দীর্ঘ পথ। ভীড় অবশ্য প্রথমটা খুব বেশী ছিল না কিন্তু লাক্‌সারে গাড়ী বোঝাই হয়ে গেল। ঘুমের আশা প্রায় ত্যাগ করতে হ'ল। বিছানা একটা ও কোণে বিছিয়ে নিয়েছিল কিন্তু সেটা গুটিয়ে গুটিয়ে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছল যে তাতে কোনমতে একটু ঠেস দিয়ে বসা যায়, শোবার কল্পনা পর্য্যন্ত অসম্ভব। যাই হোক্—তাতে ওর দুঃখ ছিল না। অল্প বয়স, স্বাস্থ্য ভাল—আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজার সময় তখনও ওর জীবনে আসেনি। তা ছাড়া, সঙ্গে ছিল ভাল ভাল বিলিতী থ্রিলার বা গোয়েন্দা কাহিনী, সময় কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট।

এম্‌নি করেই সারাদিন কাটল। একেবারে কাশীতে এসে গাড়ীটা একটু হাল্‌কা হতে বিনয় ক্লান্তভাবে বিছানাটা আবার বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ঠিক আরাম করে শোবার মত জায়গা হয়ত ছিল না, তবু কুড়ি ঘণ্টা বসে থাকবার পর এইটুকু স্থানই যথেষ্ট। এতক্ষণ গাড়ীতে এতই ভীড় ছিল যে সহযাত্রীদের দিকে সে মনোযোগ দিতেই পারেনি। বিশেষত ওর সামনের বেঞ্চে একটি মারোয়াড়ী পরিবার বসে জলে-খাবারে-ফলের খোসায়—হাতেমাটির মাটিতে স্থানটা এমনই

.ছিল যে বিনয় প্রাণপণে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে কিংবা
চেয়ে বসেছিল। এইবার শুয়ে শুয়ে গাড়ীর বাকী যাত্রীদের দিকে
. মজলিস অর্থাৎ মাঝারী সাইজের গাড়ী, মধ্যে দরজা—দুপাশে
ক'রে দুখানা বেঞ্চি। বিনয়ের ঠিক সামনের বেঞ্চিতেই বসেছিলেন
মুসলমান ও একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। ওর বেঞ্চির অর্দ্ধেকটা জোড়া
করেছিলেন এক মাদ্রাজী খৃষ্টান। একেবারে ওধারের বেঞ্চিতে জন তিনেক
হিন্দুস্থানী ছিলেন। এদিক থেকে চোখ বুলিয়ে ও-পাশের সারটায় গিয়েই
বিনয়ের দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। সামনাসামনি দুটো বেঞ্চি নিয়ে দুটি
কাবলীওয়ালা ও একটি পাঞ্জাবি পরিবার—সেদিকে মন দেবার কিছু নেই কিন্তু
এপাশের বেঞ্চিটায় যারা ছিলেন তাঁরা তারই স্বদেশবাসী, মানে বাঙ্গালী। স্বামী
আর স্ত্রী, সঙ্গে আর একটি বিবাহিতা তরুণী, হয়ত ভদ্রলোকটির বোন হবেন।
এঁরা লক্ষ্ণৌ থেকে উঠেছিলেন দুপুরে, বোধ হয় কলকাতা পর্য্যন্তই যাবেন।
ওঠবার সময় লক্ষ্য করেছিল বটে কিন্তু তখন এত ভীড় ছিল যে ভাল করে
দেখতে পায়নি। এতক্ষণে দুটি তিনটি বাঙ্গালীর মুখ দেখে ওর দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে
এল। হোক্ অপরিচিত, তবু মনে হ'ল যে আত্মীয়ের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। এত
ক্লান্ত না হ'লে হয়ত উঠে আলাপ সুরু করে দিত, এখন আর ইচ্ছা হ'ল না।
শুয়ে শুয়ে, যতক্ষণ না চোখের পাতা একেবারে বুজে এল সেইদিকেই চেয়ে রইল
শুধু। ওরা ওকে লক্ষ্য করেননি, নইলে হয়ত অসভ্য ভাবতেন, নিজেদের মধ্যেই
পারিবারিক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন।......ভদ্রলোকটির বয়স হয়েছে, চল্লিশের
কম নয়। সরকারী অপিসে মোটা মাইনের চাকরী করার মত নাদুস্-নুদুস্
চেহারা। গৃহিণীটিও তথৈবচ—মোট-সোটা শ্যামবর্ণের! রঙীন শাড়ী আর
হালকা গয়না পরে আধুনিকা সাজবার চেষ্টাটা প্রথমেই নজরে পড়ে কারণ তাঁর
আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সেটা একেবারেই বেমানান্। তরুণী মেয়েটির বয়স
কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে, অন্তত বিনয়ের তাই মনে হ'ল। বেশ সুশ্রী দেখতে,

ভাবভঙ্গীর মধ্যে উগ্র আধুনিকতা নেই বলেই শিক্ষিতা মনে হয়—কথা-বার্তার ধরণে রীতিমত সংস্কৃতির ছাপ।

কী নাম মেয়েটির কে জানে, কোথায় থাকে তাই বা কে জানে! হয়ত বালিগঞ্জেই থাকে, ওর পাড়াতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল তাহ'লে কি একদিনও পথে-ঘাটে দেখা হ'ত না! খুব-সম্ভব লক্ষ্ণৌতেই থাকে, এই প্রথম কল্‌কাতা যাচ্ছে।······অবিবাহিত তরুণ বিনয়ের মন সেই আধো তন্দ্রা আধো-জাগরণের মধ্যে কত কি কল্পনার জাল বুনে যেতে লাগল। আচ্ছা, কী নাম মানায় ওকে? রেখা? দীপ্তি? লতা? না—না, আজকালকার এই দু অক্ষরের নামগুলো ওর মোটে ভাল লাগে না। বেশ ত, তিন অক্ষরেই ভাবা যাক্ না, মঞ্জুশ্রী? সুপ্রিয়া? ইন্দ্রাণী? দীপালী? অমলা? এর কোনটাই যেন ওকে মানায় না।······তবু ওরই মধ্যে, অমলা মন্দ নয়। হয়ত আরও ভাল কোন নাম আছে ওর।·········ভাব্‌তে ভাব্‌তে ওর ক্লান্ত-চৈতন্য ঘুমে শিথিল হয়ে আসে। চশমাটা খাপের মধ্যে পুরে ও জুৎ ক'রে পাশ ফিরে শোয়। ক্ষিদে অবশ্য একটু পেয়েছিল কিন্তু এখন আর উঠে খাবার কথা ভাবা যায় না—থাক্‌গে, যদি পাটনাতে ঘুম ভাঙ্গে ত দেখা যাবে!

এরপর মোগলসরাই এসেছে ওর তন্দ্রার মধ্যেই—কে উঠেছে আর কে ওঠেনি তা টের পাবার মত ওর অবস্থা নয়। ঘুম ভাঙ্গল একবার মিনিটকতকের জন্য বক্সারে—সেই বাঙ্গালী পরিবারটি অপ্রত্যাশিতভাবে এখানেই নেমে গেলেন। কুলি ডাকাডাকিতে ওর তন্দ্রা শিথিল হয়ে এল, একবার উঠে বসলও। মেয়েটির নাম ওর জানাই হবে না কখনও, আর দেখা হবারও সম্ভাবনা রইল না। হয়ত বক্সারেই থাকে ওরা, কে জানে! এমন অদ্ভুত ষ্টেশনে নামবে, তা কে ভেবেছিল।······ওর সহযাত্রীদের মধ্যে আর একটিও বাঙ্গালী রইল না—ভাবতেই বিশ্রী লাগল বিনয়ের, কিন্তু কি আর করা যায়। বক্সার থেকে ট্রেণ ছাড়বার পরও খানিকটা চুপ করে বসে থেকে সে আবার শুয়ে পড়ল! এখানে

খোঁজ করলে হয়ত খাবার কিছু মিলত—যাক্ গে, মনে মনে বললে বিনয়। আবার অত হাঙ্গামা কে করে। বরং দানাপুরে দেখা যাবে—

এর পর আর কিছু মনে নেই ওর। শুধু প্রচণ্ড একটা শব্দ, মনে হ'ল কানের কাছে কী একটা প্রলয় ঘটে গেল। আর কতকগুলো আঘাত, পর পর। সে আঘাত বর্ণনা করা যায় না, ঠিক হয়ত অনুভবও করতে পারেনি। ঘুমের ঘোরে মনে হ'ল ওকে যেন কে কতকগুলো ভারি এবং কোণ-যুক্ত মালের সঙ্গে একটি বিরাট পিপেতে পুরে ঝাঁকি দিচ্ছে। কোথা থেকে যেন তুলে নিয়ে কোথায় ফেললে, মুহূর্ত্তের মধ্যে আরও একটা কোথা গিয়ে পড়ল। হাড় পাঁজরা যেন ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল, চামড়া সমস্ত ছিঁড়ে দড়ির মত পাকিয়ে উঠল। এ সব যেমন আকস্মিক, তেমনই দ্রুত। ব্যাপারটা কি ঘট্‌ল ভাল করে বোঝবার আগেই আবার সব যেন শান্ত হয়ে এল, আঘাতের তীব্রতা মুহূর্ত্ত কতক অনুভব করবার পরই সমস্ত চৈতন্য, বোধ করি সেই আঘাতের ফলেই, আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ তা কেউ জানে না—তখন ক-টা তাও জানবার উপায় নেই—বিনয়ের জ্ঞান হ'ল। মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ী পিট্‌ছে, বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মত ভারি কী একটা চেপে বসে রয়েছে, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়! পিঠের নীচে লোহার লাইন কিংবা মোটা রড্ বা ঐ রকম কিছু, সমস্ত পিঠটা চড় চড় করছে, ফলে হাড়ের মধ্যে পর্য্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা। দুটো পায়েরই হাঁটু থেকে নীচের দিকে কোন সাড় নেই, শুধু একটা বিশ্রী দপ্-দপানি আর থেকে থেকে কট্ কট্ করে উঠছে, একসঙ্গে অনেকগুলো ফোড়া পাকার মত!

ব্যাপারটা কি চোখ চাইবার পরও কিছুক্ষণ বুঝতে পারলে না বিনয়! ওর কিছু মনে নেই। চারিদিকে অন্ধকার। পাহাড়ের মত ওর ওপর কী যেন

স্তূপাকার হয়ে রয়েছে, আকাশ দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। ওঃ—এ যন্ত্রণা কিসের এত? সে কোথায়? এখানে কী করে এল? কী করছিল সে?…

হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে। সাহারাণপুর গিয়েছিল সেখান থেকে বাড়ী ফিরছে। সেই যে সুশ্রী মেয়েটি কোথায় যেন নেমে গেল। দিলদার নগরে? না-না, বক্সারে। কিন্তু এটা কি ট্রেণ? না, সে বাড়ীই ফিরে এসেছে?

কই না-ত! চারিদিকে কাদের এত আর্ত্তনাদ, এত গোঙানি কিসের? খুব দূরে, অনেক দূরে যেন মানুষের পায়ের শব্দ, যেন কারা কথাও বলছে। ওর ঘাড়ের ওপর এগুলো কি এত? ঐ ত একটা ফাঁক দিয়ে আকাশও এক ফালি দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের তারাভরা স্বচ্ছ আকাশ!

ঘাড় ঘুরিয়ে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলে বিনয়, পারলে না। ঘাড় ঘোরাতে পারছে না। চেষ্টা করাও অসম্ভব। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে একটুখানি নাড়তে গেলেও। তা ছাড়া এদিকে কী একটা গোঁজামত বেরিয়ে আছে, মুখ ফেরাতে গেলে ওরই চোখে লাগ্‌বে।

—তবে কি—

অকস্মাৎ দারুণ একটা সংশয়ে ওর মন ভরে উঠ্‌ল,—তবে কি দুর্ঘটনা ঘটেছে কিছু একটা? ট্রেণ পড়ে গেছে কিংবা সঙ্ঘর্ষ হয়েছে কিংবা ঐরকম একটা কিছু? যে ট্রেণখানায় ও ছিল, বোধ হয় পাঞ্জাব মেল—সেই গাড়ীটার ওপর দিয়েই দুর্ঘটনা ঘটে গেল শেষ পর্য্যন্ত? কিন্তু তা কি করে হবে। বিশেষ ক'রে বিনয় যে ট্রেণে উঠ্‌ল—সেইটেই এমন ক'রে ভাঙ্‌বে! এ যে অবিশ্বাস্য। দুর্ঘটনার কথা সে বিস্তর পড়েছে বটে কাগজে, তাই বলে সত্যি-সত্যি ওরই জীবনে সেই অভিজ্ঞতা হবে?

বিনয়ের আহত, অসুস্থ মস্তিষ্ক কিছুতেই যেন সম্ভাবনাটা মেনে নিতে পারে না! কেবলই মনে হয় ওর—তা কেমন করে হবে, কেন হবে!

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই কথাটাই বিশ্বাস করতে হয়। চারিদিকের গোঙানি শব্দ আহতদের আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কী-ইবা হ'তে পারে? ওর এই অসহনীয় দৈহিক যন্ত্রণারও আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ওর দেহের ওপর পাহাড়ের মত ঐগুলোই বা কি? গাড়ীভাঙ্গা কাঠ আর লোহার স্তূপ বলেই ত মনে হয়!

কথাটা যতক্ষণ ও ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারেনি ততক্ষণ ওর দৈহিক যন্ত্রণাটাই শুধু তীব্র ছিল। মন তখনও অবসন্ন হয়ে পড়েনি। এখন ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার না হ'লেও ঝাপসা ভাবে ধারণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর স্নায়ুকেন্দ্র থেকে একটা অবশ শৈথিল্য ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল। কপালে ঘাম ছিলই, এখন বড় বড় ধারায় তা গড়িয়ে পড়তে লাগল, সমস্ত অনুভূতিটা যেন কী একটা আশঙ্কায় ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

কিন্তু দেহের এ যন্ত্রণাও যে সহ্য করা যায় না আর! উঃ—! হাত দুটো যদি সে কোন মতে টেনে বার করতে পারত, যদি নাড়তে পারত, তা'হলেও হয়ত কতকটা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা যেতো। কিন্তু হাত দুখানাও যে ভারি পদার্থগুলোর নীচে চাপা পড়ে আছে। তা ছাড়া, আর একটা ভয়ও চুপি চুপি ওর মনের মধ্যে উঁকি মারতে শুরু করেছে তখন, হাত-দুটো ঠিক আছে ত! বাঁ হাতে ভয়াবহ রকমের একটা যন্ত্রণা হচ্ছে বটে কিন্তু ডানহাতটার যেন কোন সাড়ই নেই। হাতটা আছে কিনা তাই বা কে জানে! তবে কি—

ভয়ে, দুঃখে, যন্ত্রণায় ও চেঁচিয়ে উঠতে চাইল কিন্তু পারলে না। উঃ—বুকের এই ভারটা একটুখানি না নড়ালে ত আর নিঃশ্বাস নিতেও পারছে না। পিঠের নিচে থেকে এটা কি কোনরকমে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়? হাওয়া কি কোথাও নেই? হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করে ও বেশী ক'রে—কিন্তু শুক্‌নো গলায় হাওয়া লেগে ছুঁচ বেঁধার মত যন্ত্রণা হয়। জল, একটুখানি জল পেলেও বোধহয় যন্ত্রণা কম্‌ত খানিকটা। এমন কি কপালের ঐ ঘামের

ফেঁটাগুলোকেও যদি কোনরকমে টেনে মুখের মধ্যে ফেলা যেত! শুক্‌নো জিভটা সে আরও শুক্‌নো ঠোঁটের ওপর বারকতক বোলাল কিন্তু ওপরের ঠোঁটের দু'তিন বিন্দু লবণাক্ত ঘাম ছাড়া এতটুকু সরস কিছু মিল্‌ল না। জিভ্‌ও ভাল ক'রে নাড়তে পারছেনা যেন, সেটুকু পরিশ্রম করার ক্ষমতাও নেই।

আরও খানিকটা পরে কানের খুব কাছে দীর্ঘনিঃশ্বাস এবং অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদের শব্দ শুনে বিনয় চমকে উঠল। অনেকক্ষণ ধরেই ওর বাঁ দিকের গালের ওপর গরম একটা নিঃশ্বাস এসে লাগছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে ওর খেয়ালই ছিল না এতক্ষণ। চমকে ওঠবার পর কথাটা মনে হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হ'ল যে ওরই কোন সহযাত্রী মানুষ হবে—ওর মতই হতভাগ্য।

কথা কইবার চেষ্টা করলে ও—সেই দু তিন ফোঁটা লবণাক্ত জলেই জিভের আড়ষ্টতা অনেকটা কমেছিল কিন্তু গলা তেম্‌নি শুক্‌নো। ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে আওয়াজ বেরোল, 'আপ্‌ কোন হ্যায় ?'

সে কথার উত্তর এল না, শুধু গোঙানিটা যেন আরও বাড়ল, আর সেই সঙ্গে কাছেই কোথায় একটা যেন চুড়ির আওয়াজ হ'ল, মিষ্টি চুড়ির আওয়াজ। তবে কি ওর পাশে যে আছে সে মেয়েছেলে ? তবে কি সেই মেয়েটি ? সেই সুশ্রী বিবাহিতা মেয়েটি ? যার নাম রাখতে চেয়েছিল ও অমলা ? না না, ওরই যে ভুল হয়ে যাচ্ছে, তারা যে বক্সারে না দিলদারনগরে, কোথায় যেন নেমে গেল। না, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, সে নয়।

ও আবারও প্রশ্ন করলে, 'আপনি কে বলুন ত ?'

ঠিক পাশেই, বাঁ দিকের কাঁধের ওপর কী একটা নড়ে চড়ে উঠল। ঠিক কানের কাছে গোঙানী শব্দ—আরও বিরক্তিকর, নিজের যন্ত্রণার চেয়েও অসহ্য যেন। কাঁধ ও ঘাড়টা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে আর একবার, কিন্তু পারলেনা। মাথাটা ঝুলে আছে নিচের দিকে, সেটাও যদি কেউ সোজা করে দিতে পারত!

হঠাৎ কণ্ঠে শক্তি এনে বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই বললে বিনয়, চুপ করুন না—কষ্টত সবাই পাচ্ছে, আমিও কম পাচ্ছি না, কৈ আপনার মত গ্যাঙাচ্ছি না ত!

বলে ফেলে ও যেন এই অবস্থার মধ্যেই একটু অনুতপ্ত হয়ে উঠল। ওর মনে হ'ল মেয়েটি হয়ত বাঙালীই নয়, হয়ত মেয়েও নয়। চুড়ীর শব্দ আর কারু কাছ থেকে এসেছিল।

কিন্তু গ্যাঙানিটা সত্যি-সত্যিই এইবার থেমে গেল। আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, তেমনি ওর কানের পাশেই, এমন কি বলতে গেলে ওর কানের মধ্যেই, জড়িয়ে জড়িয়ে কে কি বললে। কথাগুলো বোঝা গেল না তবে কেমন যেন বিনয়ের মনে হ'ল কথাগুলো বাংলাই। সে-ও জবাব দিতে গেল কিন্তু আগেকার কথা কইবার চেষ্টাতেই ও রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তখন আর গলায় আওয়াজ বেরোল না। আর ওর যন্ত্রণাও যেন বেড়ে গিয়েছিল বেশী রকম—সর্ব্বাঙ্গে, ঘাড়ে, পিঠে, বুকে, হাতে পায়ে অবর্ণনীয় অসহনীয় যন্ত্রণা।

এইবার স্পষ্ট হয়ে এল ওর প্রতিবেশিনীর কথা, 'আমি, আমি উঠতে পারছিনা কেন?'

হ্যাঁ, মেয়েছেলেই বটে। অল্পবয়সী বাঙ্গালী তরুণী—তাতে আর সন্দেহ নেই। একি সেই অমলা—? না, না, সে-ত বক্সারে নেমে গিয়েছে। ও যেন মেয়েটির ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল, যথাসম্ভব ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিলে, 'উঠতে পারছেন না তার কারণ প্রায় মণ আষ্টেক ওজনের লোহা আর কাঠ আপনার এবং আমার দেহের ওপর স্তূপাকার হয়ে চাপা দিয়েছে। হয়ত বা আরও বেশী, সেই জন্যেই গা নাড়তে পারছেন না।'

'আ-আপনি ত ঠাকুর-পো নন্!'

'না।' সংক্ষেপে জবাব দেয় বিনয়।

মুহূর্ত্ত-কয়েক চুপ করে থেকে মেয়েটি আবার প্রশ্ন করে, 'আমাদের কি হয়েছে বলুন ত? আমি ঠিক ভাল বুঝতে পারছি না।'

এটা অসহ্য ন্যাকামী মনে হয় প্রথমটা বিনয়ের, তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কিন্তু পরেই মনে পড়ে যে ওরও ঠিক এই অবস্থাই হয়েছিল একটু আগে। তা ছাড়া মেয়েটির গলার সুর বড় মিষ্টি। সে ঢোঁক গেলবার চেষ্টা ক'রে বলে, 'ট্রেণ-এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে, বুঝতে পারছেন না। হয় ট্রেণটা অন্য কোন গাড়ীর ওপর গিয়ে পড়েছে নয়ত ডি-রেল্‌ড্ হয়েছে। আমরা সেই গাড়ী থেকেই ছিট্‌কে কোন মাঠে এসে প'ড়েছি আর গাড়ীর কামরাগুলো ভেঙ্গে চুরে আমাদের চাপা দিয়েছে।'

'তা হ'লে' মেয়েটি ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'তাহ'লে এই যে যন্ত্রণা হচ্ছে এটা আঘাত লাগারই যন্ত্রণা, না? তাহ'লে আমাদের হাত পা বোধহয় ভেঙ্গে গিয়েছে না?'

'খুব সম্ভব।'

'ওরা, ওরা আমাদের তুলছে না কেন?' ওর কণ্ঠস্বর যেন আর্ত্ত হয়ে ওঠে।

মেয়েটির ন্যাকামিতে বিনয়ের মনের পৌরুষ যেন ফিরে আসে। ওর প্রতি-মুহূর্ত্তের ভয়াবহ যন্ত্রণা ভুলে ও ব্যঙ্গের সুরেই প্রশ্ন করে, 'ওরাটা কারা?'

সে-প্রশ্নের পরের কথাগুলো মেয়েটি যেন বুঝতে পারে। হয়ত বা বিনয়েরই মত ভয়ে বিহ্বল হয়ে চুপ করে যায়।

বিনয়ও একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আমাদের গাড়ী দানাপুর পেরোয়নি খুব সম্ভব, তা হ'লে আমার ঘুম ভাঙ্গত। তার মানে য়্যাক্‌সিডেণ্টটা হয়েছে রাত বারোটারও আগে। হয়ত কোন ছোট ষ্টেশনের কাছে, নয়ত তা-থেকেও দূরে জনবসতির বাইরে কোথাও পড়ে আছি আমরা। শব্দ পেয়ে যদি বা দু'একজন গ্রামবাসী এসে থাকে ত তারা কতটুকুই বা করবে, কাকে আগে বাঁচাবে বলুন। তা ছাড়া যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান কেউ থাকে ত আগে সে যাত্রীদের মালপত্র চুরি করবার চেষ্টাই করবে।...বড় ষ্টেশনে খবর পৌছে রিলিফ ট্রেণ আস্‌তে আস্‌তে সেই কাল সকাল।'

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে বিনয় ক্লান্ত হয়ে চুপ করল। মাথাটা নিয়েই হয়েছে ওর সবচেয়ে অসুবিধে—কোনমতে যদি সোজা করতে পারত!

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলে, 'তাহ'লে কি কাল সকাল অবধি এই ভাবে থাকতে হবে?'

'হ্যাঁ—অবশ্য যদি ততক্ষণ বেঁচে থাকি।'

একটা নরম গাল ওর কাঁধের পর কে যেন চেপে ধরলে। বোধহয় মেয়েটিই। সে যেন শিউরেও উঠল একবার। কে এই মেয়েটি, এ কি সেই অমলা? যাকে অমলা কিংবা আরও ভাল নামে ডাকতে চেয়েছিল সে? ও—না না, তারা ত বক্সারে নেমে গিয়েছে।

মেয়েটি বললে, 'শুনেছি এসব ব্যাপারে অনেক আহত লোককে ওরা মেরে ফেলে কিংবা জ্যান্ত পুঁতে ফেলে দেয়—এ কি সত্যি!'

এত দুঃখের মধ্যেও বিনয়ের হাসি পেল, বললে, 'কী ক'রে জানব বলুন, এর আগে ত এরকম য়্যাক্সিডেণ্টের মধ্যে পড়িনি! তবে বিচিত্রও নয়—একটা মানুষের কাছে আর একটা মানুষের জীবনের মূল্য কি! যারা চুরি ডাকাতি করে তারা স্বাক্ষী রাখতে চায় না বোধ হয়, তাই জ্যান্ত মানুষগুলোকেও মেরে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়!'

মেয়েটি আবারও শিউরে উঠল। এবার যেন কান্নার সুরে বললে, 'আপনি বড্ড ভয় দেখাচ্ছেন! ঠাকুর পো কোথায়? আর মা, আবার শাশুড়ী?'

বিরক্ত হয়ে বিনয় উত্তর দিলে, 'আমি কেমন ক'রে জানব। দোহাই আপনার, একটু চুপ করুন, কানের কাছে বকবেন না।'

সে চুপ করেই রইল কিন্তু ওর গরম চোখের জল গড়িয়ে পড়ল বিনয়ের কাঁধে। বিনয়ের যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ওপাশে অনেক দূরে কান্না এসেছে। যেন দু-একটা আলোর রেখাও ওর দৃষ্টির সীমানার মধ্যে এসে

সরে-সরে গেল। ওরা কারা কে জানে! ওদের ডাকতে পারলে হয়ত কাঁধের নীচে একটা বালিশ পাওয়া যেত, আর পিঠের নীচের এই লোহাটা—

না, গলা চড়ে না একটুও। ফিস্ ফিস্ ক'রে ডাকলে ও, 'অমলা, ও অমলা, শুনছ?'

ওরা বোধহয় শুনতে পেলে না। ও কারা কথা কইছে? ওর মা আর দাদা কি? না—না, তাঁরা এখানে কোথায়? এসব কি ভাবছে ও—বোধ হয় গ্রামের লোক আলো নিয়ে এসেছে।

মেয়েটিকে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'ওদের একটু চেঁচিয়ে ডাকতে পারেন? একটু জল যদি ওরা দিত অন্তত।'

মেয়েটিও চেষ্টা করলে কিন্তু তারও গলা বেশী দূর গেল না, তেমনি ফিস্ ফিস্ করে আওয়াজ বেরোল। সে চুপি চুপি বললে, 'পারছিনা চেচাতে, এই যে কাঁধের ওপর কি একটা চেপে রয়েছে, কেমন যেন বুকে লাগছে। নিঃশ্বাস নিতেও পারছি না ভাল ক'রে। একটু সোজা হ'তেও পারছি না।'

বিনয় প্রশ্ন করলে, 'আপনারও কি দুটো হাত বন্ধ?'

'না, ডান হাতটা একটু নাড়তে পারছি কিন্তু কোন জোর নেই। তাতে এ বোঝা সরাতে পারব না।'

আবার যেন বিনয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ওদের কাঁকুলিয়া রোডের ছোট্ট বাড়ীটা। মা ওর পথ চেয়ে বসে ছিলেন, দাদা ভাবছিলেন। ওকে দেখে সকলের মুখে হাসি ফুটল। ওর ভাই-পো খোকনটা, কী মিষ্টি ছেলেটা—যেন এক ডেলা মাখন! মা বলছেন, 'কী হবে অত ব্যবসা ক'রে? না বাপু তোকে আর অত দূরে যেতে দেবো না। এই আষাঢ়েই তোর বিয়ে দেব অমলার সঙ্গে।' ও জবাব দিলে, 'অমলা? তার ত বিয়ে হয়ে গেছে মা।' 'দূর পাগল! বিয়ে কেন হবে?' 'বা-রে! আমি যে দেখলুম তার সিঁথিতে সিঁদুর, বন্যারে নেমে গেল!'

হঠাৎ শুনলে কানের পাশে মেয়েটি বলছে, 'অমলা কে বলুন ত ? আপনার স্ত্রীর নাম কি ? তিনি কি আপনার সঙ্গে ছিলেন ?'

'অমলা ? কই কেউ ত নেই আমার সঙ্গে ! আমার বিয়েই হয়নি।'

অপ্রতিভ হয়ে পড়ে সে আপনা-আপনিই। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, এখন যেন বুক অবধি শুকিয়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে গেলেই ছুঁচ বেঁধার মত কষ্ট হচ্ছে। আর একবার জিভটা সে ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করলে। আছে, দু'তিন ফোঁটা ঘাম জমেছে আবার।

শুনলে, মেয়েটি আবার প্রশ্ন করছে, 'আপনি কোথায় থাকেন ?'

'বালিগঞ্জে। আপনি ?'

'আমি ? শ্রীরামপুর। বাপের বাড়ী আমার কাশীতে, শাশুড়ী আর দেওর গিয়েছিলেন কাশীতে তীর্থ করতে, আসবার সময়ে নিয়ে আসছিলেন।'

একটু চুপ করে থেকে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিলে বিনয়, তারপর প্রশ্ন করলে, 'আপনি কি আমার গাড়ীতে ছিলেন ? মনে হচ্ছে যেন—একটি মেয়ে ছিল বটে, তারও বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু তারা যে বক্সারে নেমে গেল ?'

মেয়েটি জবাব দিলে, 'কৈ আমাদের গাড়াতে ত আর কেউ বাঙ্গালী ছিলেন না। আমরা একটা তিন বেঞ্চির ছোট ইণ্টার ক্লাস কামরায় ছিলুম।'

'তা হ'লে বোধ হয় আমার পাশের গাড়ীটাই হবে। হ্যাঁ, ছোট একটা কামরা ছিল বটে, ঠিক আমারই পাশে।'

ওরা দুজনেই কান পেতে থাকে। কারা যেন এসেছে, ওখানে একটা ছুটো-ছুটিও চলেছে। বোধ হয় নিকটের গ্রামবাসীরা আলো আর কোদাল নিয়ে এসে পৌচেছে। ওরা কি এদিকে আসবেনা ? এদিকে যেন ছায়া-মূর্ত্তির মত দুটো একটা লোক নিঃশব্দে আনাগোনা করছে, সম্ভবত যাত্রীদের মালের দিকেই ঝোঁক তাদের। কিন্তু সবাই দূরে। চেঁচিয়ে ডাকতে পারলে হয়ত

শুনতে পেত—সে ক্ষমতা নেই। কাঠ ও লোহার এই স্তূপের নিচে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে ওরা, কারুর চোখে পড়াও সম্ভব নয়।

হঠাৎ মেয়েটি যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'আর কতক্ষণ এমন ক'রে থাকতে হবে! আমি যে আর পারছিনা! ওরা কি কেউ আসবে না? ডাকুন না ওদের!'

দূরে, বোধহয় যে বগিগুলো এখনও আস্ত আছে সেখান থেকে কান্নার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তারা বোধ হয় ভয়ে কাঁদছে। আশ্চর্য্য, যারা ভাল আছে তারাও কাঁদছে, অর্থাৎ জনসাধারণের সহানুভূতিতে ওদেরও খানিকটা অধিকার আছে, এইটিই বোধহয় জানাতে চায়! একটা প্রবল, অসহ ক্রোধে বিনয়ের কপালের শিরাগুলো টন্ টন্ করতে থাকে।

মেয়েটি একটু পরেই প্রশ্ন ক'রে বসল, 'আচ্ছা য়্যাক্সিডেণ্ট কেন হয়? আজকাল ত প্রায়ই হয।'

'হয় কতকগুলো লোকের নির্ব্বুদ্ধিতায় আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়!' রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলে বিনয়, সব রাগটা ওর গিয়ে পড়ে এই দুষ্কৃতির জন্য দায়ী কর্ম্মচারীদের ওপর—'কোথাও কণ্ট্রোল থেকে ভুল ক'রে সিগ্ন্যাল দেয়, কোথাও ড্রাইভার মদ খেযে সিগ্ন্যাল ভুল দেখে, কোথাও বা স্টেশন মাষ্টার লাইন ক্লিয়ার দিতে গিয়ে গোলমাল ক'রে ফেলে! অথচ সহজেই এগুলো বন্ধ করা যায়। একটা য়্যাক্সিডেণ্টের জন্য দায়ী যারা এমন কতকগুলো লোককে ধরে সোজাসুজি যদি ফাঁসি দেওয়া যায়—কিংবা আরও কঠোর কোন শাস্তি, সেই মধ্য-যুগে ইউরোপে যেমন কোয়ার্টার করত, চারটে হাত-পা চারটে ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চালিয়ে দিত—সেই রকম শাস্তি একবার দিলেই সবাই সতর্ক হযে যায়!'

কথা বলতে বলতেই বিনয়ের গলা জড়িয়ে এল, মেয়েটি যে তার বর্ণনার পৈশাচিকতায় শিউরে উঠল তা-ও লক্ষ্য করলে না, চুপি চুপি বলে চলল,

'জানো অমলা আমি কি করব? যদি এ যাত্রা বেঁচে উঠি ত দশ বারোজন মিলে আজকের এই য়্যাক্‌সিডেণ্টের জন্য যারা দায়ী তাদের খুঁজে বার ক'রে লিঞ্চ্ করব। লিঞ্চ্ করা কাকে বলে জানো? জানো না—ঐ যে আমেরিকার সাহেবরা নিগ্রোদের করে? হয় ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলে, নয়ত গরম আল্‌কাতরার মধ্যে ফেলে দেয়—নইলে—'

মধ্যপথেই থেমে যায় সে। মেয়েটি আবারও চুপি চুপি প্রশ্ন করে 'আচ্ছা অমলা কে বলুন না? আমার নাম ত অমলা নয়।'

কিন্তু সে প্রশ্নের কোন উত্তর আসে না। বিনয়ের সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে মাথার মধ্যে, সে যেন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন। খানিক পরে অকস্মাৎ তীব্র একটা যন্ত্রণায় আবার তার সম্বিৎ ফিরে আসে, প্রায় আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে সে, 'উঃ!'

ওর সঙ্গিনী সজলকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'আপনার বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না? আমি যে কিছুই করতে পারছিনা।...আচ্ছা, মাথাটা আপনার ঝুলে আছে, না? এক কাজ করুন—না, আপনি ত ঘাড় নাড়তেই পারছেন না। আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি, আমার ডান হাতটা আপনার মাথার কাছেই আছে—এই যে, একটু ঘাড়টা তোলবার চেষ্টা করুন ত।'

সে ডান হাতটা ওর ঘাড়ের নীচে দিয়ে চালিয়ে দিলে। আঃ, এতক্ষণ পরে এই প্রথম একটু আরাম বোধ হ'ল বিনযের। কী নরম সুন্দর হাত! ওরই গলার নীচে একটি অপরিচিত তরুণীর হাত (তরুণীই নিশ্চয়, মুখ না দেখতে পেলেও, কণ্ঠস্বরে অন্তত তাই মনে হচ্ছে ওর)—আগে হ'লে কল্পনা করতেও বিনয়ের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠতো। সে অনেকক্ষণ ধরে যেন সেটা অনুভব করতে লাগল। তারপর এক সময়ে আরও চুপি চুপি বললে 'তুমি ত অমলা, না?'

'অমলা কে বলুন ত? বার বার তার নাম করছেন। আমি অমলা নই, আমার নাম ললিতা। কিন্তু অমলা কে?'

'ও, তুমি অমলা নও? হ্যাঁ, হ্যাঁ সে ত বক্সারে নেমে গেল। আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, আমি যেন মধ্যে মধ্যে আর কিছু বুঝতে পারছি না।······অমলা সেই যে মেয়েটি, দেখোনি তাকে? লক্ষ্ণৌ থেকে উঠল। সুশ্রী ভদ্র মেয়েটি। তার নাম জানি না, কিন্তু আমার তাকে অমলা বলে ডাকতে ইচ্ছা করছিল—'

হঠাৎ থেমে গেল বিনয়। আবার যেন ঘুমিয়ে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ললিতারও, কিন্তু তবু তার যেন প্রাণশক্তি ফিরে আসছে একটু একটু করে। বিনয়ের জন্য ওর দুঃখ হচ্ছে নিজের চেয়ে বেশী। ওর শাশুড়ী আর দেওর, তারা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, তারা বেঁচে নেই একথা ললিতা একবারও কল্পনা করতে পারলে না। বড়জোর তারই মত আহত হয়ে কোথাও পড়ে আছে।

এবার কোলাহল যেন কাছে আসছে, মনে হয় লোকজন অনেকে এসে পড়েছে। আর একটু, আর একটু সহ্য করবার শক্তি দাও ভগবান—আর একটু!

বিনয়ের জ্ঞান বারবার আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। তারপরই যেন সুখের ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে ওর—একবার করে জেগে উঠ্‌ছে তীব্র যন্ত্রনায়: সে আর্তনাদ সহ্য করা যায় না, ললিতার স্নায়ু অবশ হয়ে আসে তা শুনলে।

আবারও বিনয়ের চৈতন্য ফিরে এল। ওর গোঙ্গানি শুনে ললিতা ভীত-কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'আপনার গা এমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কেন? আমার গালের নীচেই ত আপনার কাঁধ—যেন বরফের মত!'

'কী জানি', শুক্‌নো জিভ্‌টা শুক্‌নো ঠোঁটে বার-দুই বুলোবার চেষ্টা ক'রে বিনয় বললে 'হয়ত শেষ হয়েই আসছে সব। সত্যি, মধ্যে মধ্যে যেন ঘুমিয়ে পড়ছি, এই ঘুম যদি না ভাঙ্গত আর ত খুশী হতুম। এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হ'ত না।···সব চেয়ে কষ্ট হচ্ছে তেষ্টায়, জিভ্‌টা একটুও যদি ভিজোনো যেত।··· আর পারছি না।'

ওর করুণ কণ্ঠস্বরে ললিতার দু-চোখ ভরে জল এল। সে একটুখানি চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলে, তার পর সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের মুখখানা তুলে বিনয়ের মুখের কাছে নিয়ে এল। চুপিচুপি বললে, 'আমার মুখ এখনো অত শুকোয়নি—আমার জিভ্‌টা একটু চুষে দেখবেন, আপনার যন্ত্রণা কমে কিনা ?'

মৃত্যুর সামনে প্রত্যক্ষ দাঁড়িয়ে তার সমস্ত দ্বিধা যেন চলে গিয়েছিল।

এ অভিজ্ঞতা শুধু অভূতপূর্ব্ব নয়—সমস্ত কল্পনার অতীত। বিনয়ের অবসন্ন ধারণাশক্তি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেও পারলে না হয়ত, শুধু একটা বিচিত্র সুখে ওর সমস্ত অনুভূতি ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। ওর শিরায় শিরায়, আর একবার, বোধ হয় শেষবারের জন্যই, রক্ত চঞ্চল হয়ে নেচে উঠল, উষ্ণতার একটা স্রোত ওর সর্ব্বাঙ্গে আর একবার ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় ডুবে থাকবার পর বিনয় বললে, 'এ আমি কখনও ভাব্‌তে পারিনি অমলা যে মরবার আগে এমন সৌভাগ্য আমার হবে। ভগবান এমন করে আমার জীবন পরিপূর্ণ ক'রে দেবেন।··· আর হয়ত দিনের আলো আমি দেখবনা, তবু মরবার পর যদি কোন অনুভূতি মানুষের থাকে ত তোমার এ দয়া আমি ভুল্‌ব না।'

তারপর আরও চুপি চুপি, আরও স্খলিত কণ্ঠে বললে, 'একটু আগেই হিসেব করছিলুম যে যদি আর নাই বাঁচি, যদি এইভাবেই চলে যেতে হয় ত কত সাধ, কত ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে যেতে হবে। ···কত স্বপ্নই দেখি আর দেখেছি। যশ, অর্থ, সব চেয়ে বেশী স্বপ্ন দেখেছি ভালবাসার। ···এই ত পেলাম আজ, দু হাত পুরে। ···অমলা, সকাল অবধি কি বাঁচব না, আর একবার তোমার মুখটা দেখে নিতুম—?'

তারপর কী ভেবে সে যেন একবার মাথাটা নাড়তে চেষ্টা করলে, 'ঐ দেখুন আবারও ভুল হচ্ছে। আপনি যে ললিতা। আপনি আরও

আপনাকে দেখিনি, তবু আপনি আরও সুন্দর! ...আশ্চর্য্য, শরীরের নীচের দিকে যেন আর কোন যন্ত্রণা নেই, শুধু এই পিঠটা যদি—অমলা, অমলা, তোমার হাতটা দিয়ে আমাকে আরও জড়িয়ে ধরতে পারছ না—আরও?'

শেষের শব্দটা যেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বেরিয়ে এল। তারপরই সে চুপ করে গেল। নিঃশ্বাস পড়ছে এখনও, কিন্তু দেরিতে, আর তার কি শব্দ। আচ্ছা একেই কি শ্বাস-ওঠা বলে? সমস্ত শরীর যে আবার ঠাণ্ডা হয়ে এল।

'শুনছেন? শুনছেন, কথা বলুন না, আমার যে বড় ভয় করছে।'

কিন্তু বিনয় আর কথা বললে না, তখনও না, আর কোন দিন, কখনই না।

দূরে ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, ললিতা কান পেতে শুনলে। রিলিফ ট্রেনটা বোধহয় এসে পৌঁছল!

যৌবন-স্বপ্ন

নভেম্বর মাসের প্রথমেই উপেনদা আসিয়া ধরিলেন তাঁহার লেখা পাঠ্যপুস্তক কয়খানি লইয়া পশ্চিম-বঙ্গটি ঘুরিয়া আসিতে হইবে।

কহিলেন, 'ভাই ব'সে ত আছিস্, যদি এই উপকারটুকু করিস্!...বাজারে যে সব ক্যানভাসার পাওয়া যায় তাদের কাউকে বিশ্বাস নেই; অবিশ্যি টাকা আমি দেব—কিন্তু তুই গেলে যেমন নিশ্চিন্ত হতে পারি'—ইত্যাদি—

এ কাজে আমার খ্যাতি ছিল। কিন্তু আর কখনও পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ঘাড়ে করিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়দের বিরক্ত করিতে যাইব না স্থির করিয়াছিলাম—এটাও ঠিক। তবে টাকার দরকার সে সময়টায় খুবই ছিল, উপেনদা দুই চারিবার বলার পরই রাজী হইয়া গেলাম। মনটা কিন্তু ভার হইয়াই রহিল,

আবার সেই স্কুলে স্কুলে ঘোরা, হেডমাষ্টার মহাশয়দের ধৈর্য্যের উপর আবার সেই উৎপীড়ন! মফস্বলের শিক্ষকরা অধিকাংশই ভদ্রলোক, কিন্তু তবুও ভাবি যে প্রত্যহ হরেক রকমের ক্যানভাসারের অত্যাচার তাঁহারা সহেন কি করিয়া!

যাক্—বাহির হইয়া পড়িলাম। এদিকে সবই প্রায় জানা-শুনা, সকলেই স্নেহ করেন সুতরাং কাজও অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। প্রথম দিককার খুঁত-খুতে ভাবটা শীঘ্রই চলিয়া গেল, মহা উৎসাহে উপেনদার বই-এর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু গোল বাধিল মুর্শিদাবাদে গিয়া।

বহরমপুরেই শরীরটা খারাপ হইয়া আসিয়াছিল তাহার উপর কাঁদী গিয়া আহারাদির যথেষ্ট অত্যাচার হইল; কাজেই কাঁদী হইতে ফিরিয়া যেদিন মুর্শিদাবাদ গেলাম সেদিন উদরাময় আর জ্বর ভালরকমই দেখা দিয়াছে।

মুর্শিদাবাদে ভাল হোটেল নাই জানিতাম, ভরসা ছিল ডাক-বাংলো। ডাক বাংলোয় পৌঁছিয়া শুনিলাম কোথা হইতে জন চারেক টুরিষ্ট্-সাহেব আসিয়াছেন, সেখানে স্থান হইবে না!

কিন্তু তখন আর আমার দাঁড়াইয়া থাকিবার মত অবস্থা নয়। ফিরিয়া আসিয়া সেই উড়িষ্যাবাসী ঠাকুরের হোটেলেই উঠিলাম। হোটেল সেটা নয়—এক কথায় ভাতের দোকান। সকাল ও সন্ধ্যায় বাহিরের লোক খায় ও চলিয়া যায়, সেখানে থাকিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। একটি অত্যন্ত অন্ধকার ঘরের একদিকে থাকিত গোরুর খড়, অপরদিকে একটি ভাঙ্গা তক্তাপোষ। তাহার মাঝের তক্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া পতনরোধের জন্য নীচে এক থাক ইট সাজানো আছে বটে কিন্তু তাহা যথেষ্ট উঁচু হয় নাই, ফলে মাঝখানটা চারিপাশ হইতে অনেকখানিই নীচু।

ঠাকুর সেই অদ্বিতীয় তক্তাপোষটিই ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া সাফ করিয়া দিল। তখন আমার অবশ্য অত দেখার অবস্থা নয়, কোনও রকমে বিছানাটা

বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘরের ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধ বা অন্ধকার কিছুতেই তখন বিচলিত হইবার অবস্থা ছিল না!

পরের দিন কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যখন ব্যাপারটা উপলব্ধি করিলাম তখন যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। দৈহিক অবস্থা তখনও খুব খারাপ, সেখান হইতে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং সেখানেই থাকিতে হইবে। অথচ সেই ঘর—সে যেন নরককুণ্ড। অনেক ভাবিয়া ঠাকুরকে ডাকিলাম।

কহিলাম, 'নরোত্তম, কাছাকাছি এখানে কারুর বাড়ীর ঘর-টর ভাড়া পাওয়া যাবে না? তাহ'লে দু'একদিন সেখানেই থাকতুম। খাবার-দাবার অবিশ্যি তুমিই করে দিতে পার, কিন্তু এখানে থাকতে বড্ড অসুবিধে হচ্ছে।'

নরোত্তম অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, 'এখানে ত কৈ সেরকম ত মনে পড়ছে না, তবে গাঙ্গুলী মশায়কে একবার জিগ্যেস ক'রে দেখতে পারি; ওদের অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছে, দু'একটাকা দিলে হয়ত রাজী হতে পারে।

আমি সাগ্রহে কহিলাম, 'দেখনা ঠাকুর, যা চায় আমি দেব।'

নরোত্তম অভয় দিল, ডালটা চাপাইয়াই সে গাঙ্গুলীর খোঁজ করিতে যাইবে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, হে ভগবান, গাঙ্গুলী যেন রাজী হয়। যদি-চ গাঙ্গুলীর বাড়ী দেখি নাই, তবুও তাহা যে ঠাকুরের এত গর্তের চেয়ে ভাল হইবে তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

আধ ঘণ্টাটাক পরে নরোত্তমের সহিত একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক দেখা দিলেন। একটি ছেঁড়া কিন্তু পরিষ্কার উড়ানী গায়ে জড়ানো, পায়ে এক জোড়া জরাজীর্ণ খড়ম। অনুমানে বুঝিলাম ইনিই গাঙ্গুলী। গাঙ্গুলী মহাশয় ভূমিকা না করিয়াই কহিলেন, 'নরোত্তমের মুখে খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, সে কি কথা, ভদ্রলোকের ছেলে বিদেশে এসে অসুখে পড়েছেন আমরা থাকতে তাঁর শুশ্রূষা হবে না? চলুন, আমি অপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি, নরোত্তম আপনার

জিনিষ-পত্র আর বিছানা পাঠিয়ে দেবে এখন। নরোত্তম ঠাকুর লোক ভাল, এমন ঠাকুর এ অঞ্চলে আর নেই—'

বলিতে বলিতেই তিনি আমার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। কহিলেন, 'আমার বাড়ী এই পেছনেই—এইটুকু হেঁটে যেতে পারবেন ত?'

আমি তখন সে গর্ত্ত হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি। আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হইলাম। নরোত্তমকে একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া কহিলাম, 'ওটা তোমার কাছেই রাখ; এবেলা একটু জলবালিই—'

গাঙ্গুলী মশাই বাধা দিয়া কহিলেন, 'বিলক্ষণ আমি সাবু করতে বলে তবে এখানে এসেছি। আমার কুঁড়েয় যাবেন আর একটু সাবু-বার্লী যাবে হোটেল থেকে?'

লজ্জিত হইয়া নরোত্তমকে কহিলাম, 'আচ্ছা তবে থাক। বিছানাপত্র-গুলো পাঠিয়ে দাও, পয়সা আর ফেরৎ দিতে হবে না।'

চলিতে-চলিতে গাঙ্গুলী কহিলেন, 'পারুলকে বাইরে একটা বিছানা ক'রে রাখতে বলে এসেছি।···পারুল আমার বড় মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে বাবু; কিন্তু কষ্ট পাচ্ছি সে কেবল অদৃষ্ট-দোষে।'

কী কষ্ট সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার মত ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না; তবে অনুমান করিতে পারিলাম যে পাত্র জুটিতেছে না।

মিনিট তিনচারের মধ্যেই গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ী পৌঁছিলাম, বহুকালের জরাজীর্ণ বাড়ী, এককালে অট্টালিকাই ছিল—কিন্তু সে বোধ হয় সেই মুর্শিদ-কুলীখাঁর আমলে—তাহারই বাহিরের ঘর। ঘরে বালির কাজের চিহ্নমাত্রও নাই, মেঝেও নিজের অস্থি দেখাইতে লজ্জা পায় না, এই অবস্থা। কিন্তু উহারই মধ্যে ঘরটি যতটা সাফ্ রাখা সম্ভব তাহা রাখা হইয়াছে।

একপাশে জানালার ধারে একটি তক্তাপোষের উপর বিছানা করা

রহিয়াছে। তাহার উপকরণ সামান্যই—কিন্তু সেখানেও একটা জিনিষ নজরে পড়ে, তাহা পরিচ্ছন্নতা।

আমি পৌঁছিয়াই গায়ের কাপড়টা টানিয়া শুইয়া পড়িলাম। গাঙ্গুলী ব্যস্ত হইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ঝিরঝিরে গঙ্গার হাওয়ায় বোধকরি একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল, সহসা কাহার অতি মধুর কণ্ঠস্বর কানে আসিয়া বাজিল, 'আপনার বার্লি কি এখন আন্‌ব?'

চমকিয়া চোখ মেলিলাম, বছর-ষোলর একটি মেয়ে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া। সবে স্নান সারিয়া আসিয়াছে, বিপুল সিক্ত কেশরাশি সারা পিঠ জুড়িয়া রহিয়াছে, সুন্দরী নয়, কিন্তু সেদিকে চাহিয়া যেন সহসা চোখ জুড়াইয়া গেল—তাহার সারা দেহ ঘেরিয়া এমনিই চমৎকার একটি শ্রী বিরাজ করিতেছিল।

আমার বিহ্বল চাহনীতে যেন একটু লজ্জা বোধ করিয়া সে চোখ নামাইল। কহিল, 'বার্লি কি আন্‌ব?'

আমি কহিলাম 'বার্লি না সাবু? তোমার বাবা যে বল্‌লেন সাবু করা আছে?'

মেয়েটি জবাব দিল, 'আপনি বার্লি খেতে চেয়েছেন শুনে আবার বার্লি করা হোল।'

আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, 'কি আশ্চর্য্য, আবার বার্লি কেন? সাবুই খেতুম না হয়, আচ্ছা নিয়ে এস—'

মিনিটখানেক পরে পারুল একটা পাথর বাটীতে বার্লি ও একটা রেকাবীতে খানকতক কাঁচকলা ভাজা লইয়া ঘরে ঢুকিল, পিছনে গাঙ্গুলী।

গাঙ্গুলী কহিলেন, 'শুধু জলবার্লি খাবেন তাই গিন্নি বল্লেন খানকতক কাঁচকলা ভেজে একটু মরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে দিই, জ্বরের মুখে ভাল লাগ্‌বে অথচ পেটের অসুখেরও উপকার হবে—'

সত্যই ভাল লাগিল। লেবু নুন ও মিশ্রী মেশানো বার্লি ও মরিচের গুঁড়া

দেওয়া কাঁচকলা ভাজা খাইতে খাইতে বাড়ীতে মায়ের কথা মনে পড়িল ; বিদেশে এমন যত্নের কথা কল্পনা করাও যায় না।

পারুল বাহির হইয়া গিয়াছিল, গাঙ্গুলী মহাশয়কে বলিলাম, 'গোটাদুই টাকা রাখুন গাঙ্গুলী মশাই, এর পর নোট ভাঙ্গিয়ে আরও কিছু দেব—

গাঙ্গুলী মহাশয় জিভ্ কাটিয়া হাত জোড় করিয়া কহিলেন, 'না বাবু মাপ করবেন ; গরীব হয়েছি, খেতে পাইনা একথা সত্যি—কিন্তু এখনও যখন বাপ পিতামহর ভিটেতে বাস করছি, তখন সাবু-বার্লির দাম নিতে পারব না। আপনি বিদেশী লোক, আপনার সামান্য উপকার যদি আমার দ্বারা হয় ত সেই আমার সৌভাগ্য, কিন্তু তার জন্য টাকা নিতে আমায় বল্‌বেন না—'

আমি অভিভূত হইয়া কত কি বলিতে গেলাম, কিন্তু তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, 'ব্রাহ্মণকে পাপে জড়াবেন না আর, মাপ করুন।'

পরমুহূর্ত্তেই সবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

দুর্ব্বল দেহ, বেশীক্ষণ ভাবিবার মত শক্তি ছিল না। শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই মহৎ পরিবারটির কথা এবং কি করিয়া ইঁহাদের ঋণ শোধ দেওয়া যায় সেই কথা কিন্তু কখন যে এই সব চিন্তার মধ্যে একটি সদ্যোস্নাতা কিশোরীর মুখ মনে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কত চিন্তা কত কল্পনা অলস মনে জাল বুনিয়া ঘুরিতে লাগিল তাহা বুঝিতেও পারিলাম না।

জ্বর সারিল ; পেটেরও গোলমাল নাই। কিন্তু তবুও দুর্ব্বলতার অজুহাতে দিন কাটিতে লাগিল। উপেনদা'কে আগেই চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলাম অন্য ব্যবস্থা করিতে, টাকাও কিছু আনাইয়াছি। কিন্তু আর থাকা যায় না—

গাঙ্গুলী মহাশয় আর তাঁর স্ত্রী ঠিক নিজের ছেলের মত যত্ন করেন।

দিন-রাতের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা আমার জন্য ব্যস্ত থাকেন, নানাবিধ খাদ্য আর নানারকমের স্বাচ্ছন্দ্যের তদ্বিরেই তাঁহাদের দিন কাটে। কিন্তু সেই আকর্ষণই-ত সব নয়? ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ব্যাপারটা ভাল রকমেই ধরা পড়িয়াছে যে আমার এই বাড়ী না যাওয়ার মূলে রহিয়াছে ঐ আশ্চর্য্য মেয়েটি—

পারুল সেবা ও ব্যাকুল আগ্রহে তাহার বাপ-মাকেত বহুদিনই ছাড়াইয়া গিয়াছে—তাহার প্রতিটি মুহূর্ত্ত যেন আমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই নিঃশেষে ব্যয়িত হইতেছে। আমার ঘর ঝাড়ে সে দিনের মধ্যে তিনবার; পাঁচ মিনিটের জন্যও বাহিরে গেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখি ইতিমধ্যে একবার বিছানা ঝাড়া হইয়া গিয়াছে। জামা-কাপড়ে রোজই সাবান দেওয়া হইতেছে; বালিশ রোদে দেওয়া হইতে সুরু করিয়া জুতা বুরুশ করা পর্য্যন্ত সব কাজ বারবার করিয়াও যেন তাহার তৃপ্তি হয় না।··· একটুখানি বাহিরে গেলেই তাহার দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না, বারবার ব্যাকুলভাবে অনুযোগ করিতে থাকে, 'আবার আপনি অতটা হেঁটে এলেন? দেখুন দেখি, আপনি রোগা মানুষ যদি পথে কোথাও পড়েই যান্!

নয়ত—

'ঘোরাঘুরি ক'রে আবার যদি অসুখ বাড়িয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু আমি রক্ষে রাখ্‌ব না—। কতদূর হেঁটে এলেন? বাজার পর্য্যন্ত ত?'

বুঝিতে পারি যে চক্ষুলজ্জার দিক দিয়া আর একদিনও থাকা উচিত নয়, এতদিন থাকাও অন্যায় হইয়াছে, তবুও নড়িতে পারি না। ইঁহারা টাকাকড়ি নেন্ না, মধ্যে মধ্যে বাজার করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতেও অনুযোগের সীমা নাই। এই ব্যাপারে আমার থাকাটা আরও অশোভন হইয়া পড়িয়াছে—তাহাও বুঝি, কিন্তু তবুও নড়িতে পারি না। একটু বাহিরে গেলেই মন সেই সেবারত মুখখানির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, দীর্ঘকালের জন্য ছাড়িয়া থাকিব কি করিয়া?

এক একবার ভাবি, ইঁহারা ত আমারই স্বঘর, বিবাহের প্রস্তাবটা করিয়াই ফেলি; পরক্ষণেই নিজের সামান্য আয়ের কথা মনে পড়ে,—ছোট রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারি না।

দিন কিন্তু কাটিতেই থাকে—অথচ আর কোনও অজুহাতেই থাকা চলে না, তাহাও বুঝিতে পারি।

একটা জিনিষ কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকে। যে পারুল দিনের বেলায় প্রতিনিয়ত আমার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যস্ত থাকে, সন্ধ্যার পর তাহাকে কোন দিন, কিছুতেই দেখা যায় না কেন?

প্রথম প্রথম প্রশ্ন করিলে গাঙ্গুলী মহাশয় বা পারুলের মা বলিতেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছে,—ও একটু সকালেই ঘুমোয়।'

কিন্তু প্রত্যহ একটা লোক ঠিক সন্ধ্যা হইতেই ঘুমায় কি করিয়া? পারুলকে প্রশ্ন করিলে সে শুধু মুখ টিপিয়া হাসে, জবাব দেয় না। কর্ত্তা বা গৃহিণী এ বিষয়ে কথা উঠিলেই জোর করিয়া অন্য প্রসঙ্গ পাড়েন তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি; সুতরাং সন্দেহভঞ্জন করি কি করিয়া? আরও সন্দেহের কারণ—ইদানীং যখন বাড়ীর ভিতরে যাওয়ায় আর সঙ্কোচ রহিল না, তখন একাধিক দিন লক্ষ্য করিয়াছি সন্ধ্যার পর হইতেই উঁহাদের শয়ন ঘরের দ্বার বন্ধ থাকে, বাহির হইতে। 'পারুল ঘুমোচ্ছে কিনা—' গৃহিণীর এই মন্তব্যে খুশী হইতে পারি নাই, কারণ সেজন্য বাহির হইতে দরজা বন্ধের কারণ কি?

যাহাই হউক, এধারে আমার যাত্রার দিন স্থির করিয়া ফেলিলাম। ইঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য, কিন্তু তবুও কিছু করা উচিত; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, কাপড় কিনিয়া দিলে নিশ্চয়ই কিছু বলিতে পারিবেন না। শুক্রবার দিন ফিরিব স্থির করিয়াছিলাম কাজেই বৃহস্পতিবার বাজারে গেলাম—

গৃহিনীর জন্য একখানি তাঁতের শাড়ী, কর্ত্তার জন্য থান ও পারুলের জন্য একখানা ছাপা গরদের কাপড় কিনিয়া ফেলিলাম। দাম হয় ত কলিকাতার চেয়ে কিছু বেশীই পড়িল, কিন্তু সে কথায় আর লাভ কি ?

বাড়ী ফিরিতে গাঙ্গুলী মহাশয় বকাবকি করিলেন, গৃহিণী অভিমান প্রকাশ করিলেন কিন্তু পারুল সোজাসুজি খুশীই হইল। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টি, সলজ্জ হাসিতে সে কথা বারবার প্রকাশ পাইল। শাড়ীখানি সে সারাদিন নাড়াচাড়া করিল কিন্তু প্রাণ ধরিয়া পরিতে পারিল না। তাহার মা-ও বলিলেন, 'এম্‌নি প'রে নষ্ট ক'রে কি হবে, তার চেয়ে তুলে রাখ্‌—কোথাও যেতে-আসতে পরবি তখন্।...'

সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার ঘুম আসিল না ; কাল বৈকালে ইঁহাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িতে লাগিল। এম্‌নি করিয়া কখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে টের পাই নাই, সহসা চমক ভাঙ্গিতে জোর করিয়া ঘুমাইব ভাবিতেছি এমন সময় ভেজানো কপাট ধীরে ধীরে খুলিবার শব্দ হওয়ায় চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার অসুস্থতার অজুহাতে সারারাত ঘরে আলো জ্বলিত, সেই ক্ষীণ প্রদীপের আলোতে চাহিয়া দেখি আমারই দেওয়া ছাপা গরদের কাপড় পরিয়া পারুল ঘরে ঢুকিতেছে !—এ কি, পারুল ? এত রাত্রে ?

এই প্রথম সন্ধ্যার পর পারুলকে দেখিলাম। সে আমার বিস্ময়কে আরও বাড়াইয়া কহিল, 'পালিয়ে এসেছি। আমায় ওরা বেরোতে দেয় না। সন্ধ্যে হলেই শেকল দিয়ে রাখে—'

ততক্ষণ সে ঘরের মধ্যে আসিয়াছে, প্রদীপটা উস্‌কাইয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আমায় কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি ?'

সত্যই তাহাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী মনে হইতেছিল। শুধু সে সিল্কের শাড়ীই

পরে নাই, পরিপাটী করিয়া কেশ প্রসাধন করিয়া সাজিয়া আসিয়াছে; সে দিকে চাহিলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়।

কহিলাম, 'চমৎকার। কিন্তু তোমাকে ওরা আট্‌কে রাখে কেন?'

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'জানি না। বোধ হয় মনে করে পালিয়ে যাব। যাইহোক—কিছুতেই বেরোতে দেয় না। আজ কিন্তু আমি পালিয়ে এসেছি—'

'কেন এলে পারুল?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে। তুমি কাল চলে যাবে বল্‌ছ কিন্তু আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব কি করে? আর সেখানেই বা তোমায় দেখবে কে? যা অসাবধান তুমি!'

প্রতি কথাটি যেন ক্ষত-বিক্ষত বক্ষে অমৃতের প্রলেপ দিতেছিল। আবেগ-কম্পিত স্বরে কহিলাম, 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে পারুল? আমায় বিয়ে করবে?'

সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল, 'ওমা, তাও কি তুমি বুঝতে পারোনি?'

'কিন্তু আমি যে গরীব। আমায় বিয়ে করলে তুমি কষ্ট পাবে!'

'কিসের কষ্ট? গরীব বলে? আমার বাবাও-ত গরীব! কিচ্ছু ভেবো না, তুমি আমায় যা এনে দেবে তাইতেই আমি সংসার চালিয়ে নেব; না হয় ত পরের বাড়ী রেঁধে দিয়ে আমিও কিছু রোজগার করব। তোমার কষ্ট হতে দেব না কিছুতেই।'

আমি ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাত-দুটি ধরিয়া কহিলাম, 'তুমি আমায় বাঁচালে পারুল, আমি এই কথাই ভাবছিলুম ক'দিন।'

অকস্মাৎ সে হাত-দুটি টানিয়া লইয়া কহিল, 'ওমা আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, আমি যে পেত্নী! আমায় চিন্‌তে পারছ না? গত জন্মে আমি তোমার স্ত্রী ছিলুম, এ জন্মে পেত্নী হয়েছি।'

তাহার পরই সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে শুরু করিল, কিন্তু সে হাসি পরিহাসের হাসি নয়, সে হাসি যেন পাগলের হাসি—!

পাগল ?

বুকে যেন কে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল; পাগল! পারুল পাগল! রাত্রে তাহা হইলে তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখার এই-ই কারণ?—'পারুল! পারুল! লক্ষ্মীটি, চুপ করো, অত হাসছ কেন?'

পারুল আরও জোরে হাসিতে লাগিল, হাসিতে হাসিতে কহিল, 'তোমার ভয় করবে না? পারবে আমায় বিয়ে করতে?···না, তোমায় বিয়ে করব না, জগদীশকে বিয়ে করব, শুনছ? জগদীশকে!'

সমস্ত বুকটা যেন কে ভারী পাথরে পিষিয়া দিয়া গেল। হায়রে! ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া প্রতিদিন তিলে-তিলে মধুর যৌবন-স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। ···নির্ব্বোধের মত—স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু এই মানুষকেই ত দিনের বেলায় প্রত্যহ দেখিয়াছি, কখনও ত উন্মাদের চিহ্নমাত্রও দেখি নাই!

গাঙ্গুলী মহাশয় ও পারুলের মা দ্রুতবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পারুলের মা গঞ্জনা দিয়া উঠিলেন, 'আবাগী, ফাঁক্ পেয়েই চলে এসেছিস্? মাগো—কাপড়খানার কি দুর্গতি! চল্, শুবি চল্ শীগগির!'

হাত ধরিয়া টানিতেই পারুল সহসা আমার কাছে আসিয়া কোলের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'না-গো আমি তোমাকেই বিয়ে করব, আমায় ধ'রে রাখো; নৈলে ওরা বড্ড মারবে।'

ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া পারুলের মা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, 'হতভাগী আমার হাড় ভাজা-ভাজা করলে, মান-সম্ভ্রম, ইজ্জৎ কিছু রাখলে না!'

গাঙ্গুলী মহাশয় আমারই বিছানার একপাশে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'কী জ্বালা যে বুকের মধ্যে অহর্নিশ জ্বলছে বাবু, এ কথা শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন!'

আমিও কথা কহিতে পারিতেছিলাম না, অনেক কষ্টে কহিলাম—'কিন্তু একদিনও ত আমি লক্ষ্য করিনি!'

গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন, 'দিনের বেলায় ও ভালই থাকে, আজ তিন-চার বছর হোল শুধু রাত্রি বেলায় ওর কথাবার্ত্তা গোলমাল হয়ে যায়—উন্মাদের লক্ষণ!'

'কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন?'

'কোথা থেকে করব বাবু? টাকা চাই ত? দৈব-টৈব দু' চারটে করিয়েছি—ফল হয়নি। এ-কথা কাউকে বিশেষ বলিও না। পাছে পাঁচজন সে কথা আলোচনা ক'রে মাকে আমার লজ্জা দেয়।'

আর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমিও তেমনিই বসিয়া রহিলাম, সারারাত একটুও ঘুম আসিল না।

পরের দিন ভোর বেলাই বাহির হইয়া পড়িলাম। তখনও পারুল ওঠে নাই। পাছে দিনের বেলা চোখো-চোখি হওয়ায় সে লজ্জা পায় বলিয়া তখনই বাহির হইয়া আসিলাম। তাহার বাপ-মাও বাধা দিলেন না। পারুলের মা চোখ মুছিলেন, বাবা স্টেশন পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন।

ট্রেণ হু-হু করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু আমার ও তাহার মধ্যে যতই দূরত্বের ব্যবধান বাড়িতেছিল, ততই যেন বুকের মধ্যে মোচড় দিতেছিল। তাহার সেবা, তাহার স্নেহ, তাহার সেই সপ্রেম মুখ কখন্ মনের মধ্যে এত গভীর রেখাপাত করিয়াছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই।

ভাবিতেছিলাম সে-বেচারীর দোষ কি? আর কিসেরই বা আমার ভালবাসা, তাহার বাপ-মা এই তিন বৎসর ধরিয়া যাহা সহ্য করিয়াছে একদিনেই তাহা আমার মনের সব ভালবাসা নষ্ট করিয়া দিল!

চতুর্দোলা

বাড়ীতে পৌছিয়া যত ভাবিতে লাগিলাম, ততই মাথা গরম হইয়া উঠিল। শেষকালে কোন্ এক মুহূর্ত্তে স্থির করিয়া ফেলিলাম পারুলকেই বিবাহ করিব। নিজের কাছে রাখিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় তাহাকে ভাল করিয়া তুলিব। না হয় আমার বুকভরা ভালবাসা দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিব—কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

এই সঙ্কল্পের সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত মন যেন পুলকে ডুবিয়া গেল। সারারাত কখনও তন্দ্রায়, কখনও জাগরণে সোনালী স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিলাম। সকালে উঠিয়া মাকে বলিলাম, 'মা আমি বিয়ে করব।'

মা খুশী হইলেন, 'বেশ-ত বাবা, চারুকে চিঠি লিখি, ওদের গাঁয়ে ভাল মেয়ে আছে।'

—'মেয়ে আমার দেখা আছে, মা। তার বাপকে চিঠি লিখছি সব ঠিক করতে।'

মায়ের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন মাকে সব কথাই খুলিয়া বলিলাম, এবং—বহু মিনতি ও যুক্তির পর তাঁহাকে রাজী করাইলাম।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের জবাব শীঘ্রই আসিল। শোকার্ত্ত পিতার দীর্ঘ পত্রের ভারে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইব না, তবে তাহার মর্ম্মার্থ এই—

আমি চলিয়া আসিবার পর পারুল উঠিয়া আমার খোঁজ করে। সেই সময় সহসা তাহার মার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় তিনি বহু গঞ্জনা দেন। সেই সব গঞ্জনার মধ্য হইতে সে পূর্ব্ব রাত্রির কথা সবই জানিতে পারে। তখন কিছুই বলে নাই, কিন্তু অপরাহ্ন হইতে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পরদিন সকালে নসীপুরের ঘাটে তাহার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিয়াছিল।*

* এই গল্পটির রচনাকাল ১৯৩১

সমাপ্ত